দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

পাকিস্তানের জম্মু-কাশ্মীর দখল দিবাস্বপ্ন মাত্র

পৃঃ - ১২

সমাজ সংস্কারের উদাত্ত আহ্বান

পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ৭ নভেম্বর ২০১৬।। ২১ কার্তিক - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

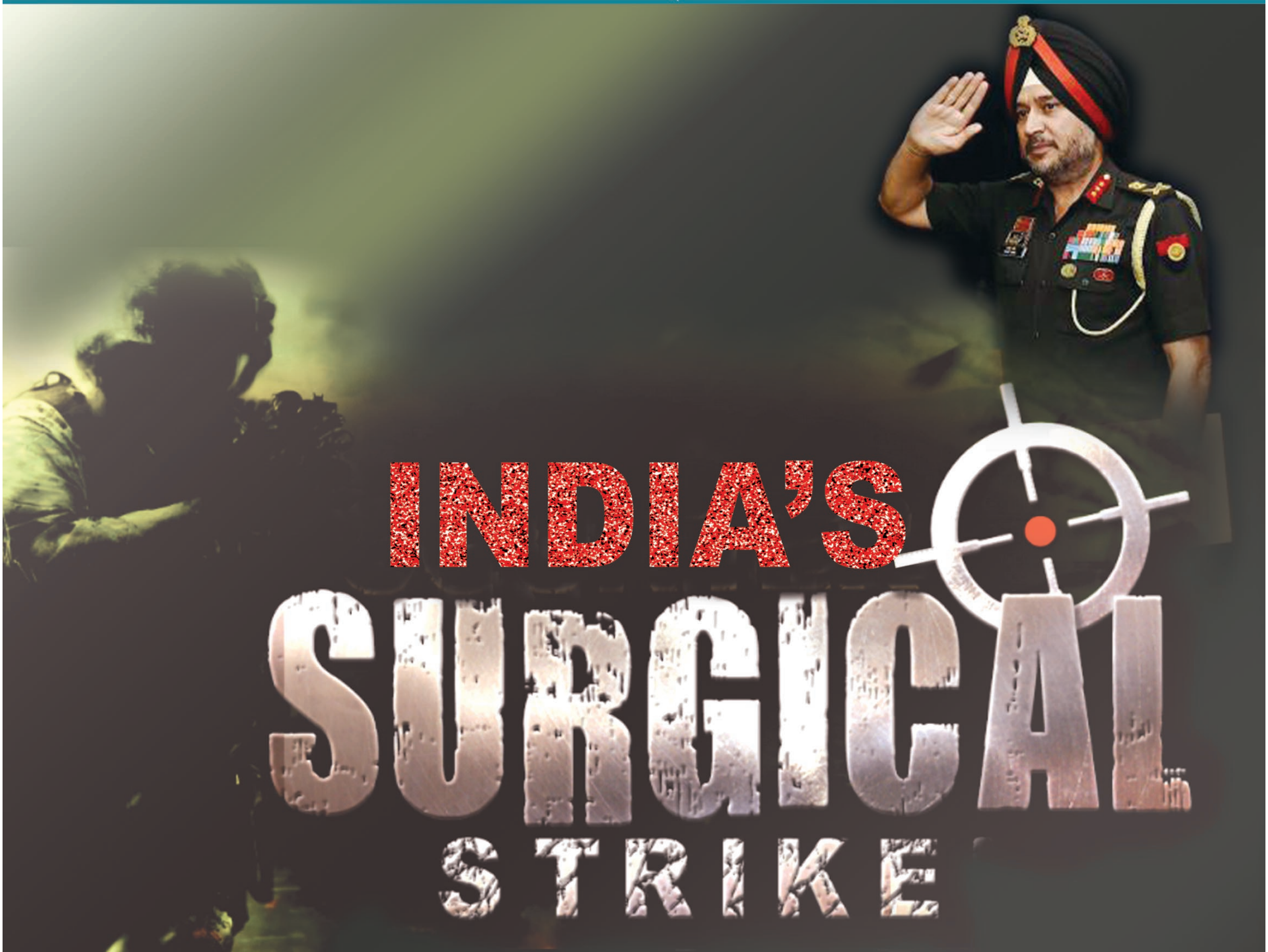

বিরোধীরা এত বিচলিত কেন ?

- বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ভয়েই কি বিরোধী দলগুলি প্রথমে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-কে স্বাগত জানিয়েও পরে অবস্থান বদল করল ?
- সংখ্যালঘু ভোটের লালসাই কি এই অবস্থান বদলের কারণ ?
- সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ চেয়ে পাকিস্তান ও পাক-অনুরাগীদের খুশি করা গেলেও বাস্তবে এটা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক এবং বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি ?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ২১ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৭ নভেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ■ ৬-৯

পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু পাচার চক্রের বড় কেন্দ্র
■ মাধবী মুখার্জী ■ ১০

খোলা চিঠি : কেন্দ্রকে হিংসা করতে হবে, তবেই রাজ্যের উন্নতি ■ সুন্দর মৌলিক ■ ১১

পাকিস্তানের জম্মু-কাশ্মীর দখল দিবাস্বপ্ন মাত্র
■ মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) ■ ১২

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক : ভারতীয় বিদেশনীতির সাবালকত্ব প্রাপ্তি
■ প্রণয় রায় ■ ১৪

চীন-পাকিস্তান বাঁচলে দেশের নাম ■ অভিমন্যু গুহ ■ ১৭

দেবী জগদ্ধাত্রী ■ দেবপ্রসাদ মজুমদার ■ ২১

জগদ্ধাত্রী যেখানে 'বুড়ো মা' ■ সপ্তর্ষি ঘোষ ■ ২২

সাঁচী স্তূপ ■ সৌমেন নিয়োগী ■ ২৩

সমাজ সংস্কারের উদাত্ত আহ্বান ■ রাকেশ সিন্‌হা ■ ২৭

সিঙ্গুর প্রকরণ, শিল্পায়ন ও জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজনে এক সাহসী, সময়োচিত ও ন্যায়োচিত পদক্ষেপ
■ সুব্রত ভৌমিক ■ ২৯

হঠাৎ চীনা প্রেসিডেন্টের দৌড়ঝাঁপ, বাংলাদেশ কি পড়ছে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডে? ■ ৩২

কেন্দ্রের শরণার্থী নোটিফিকেশন রাজ্যে কেন কার্যকরী হচ্ছে না? ■ ধর্মানন্দ দেব ■ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ■ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ■ **অঙ্গনা : ২৬** ■ **অন্যরকম : ৩৩** ■ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৮** ■ **খেলা : ৩৯** ■ **শব্দরূপ : ৪০** ■ **চিত্রকথা : ৪১** ■ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পার্সোনাল ল-এর আড়ালে নারী শোষণ না অভিন্ন দেওয়ানি বিধি?

তিন তালাক নিয়ে শুধু মুসলমান মহিলারা নন, সারা দেশ চিন্তিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গটি আবার উঠে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে— পার্সোনাল ল-এর আড়ালে কি চলতে দেওয়া উচিত অবাধ নারী শোষণ?— আলোচনা করেছেন ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং অমলেশ মিশ্র।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা

কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতা করিবার জন্য মমতা সরকার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করিতে রাজি নয়। ছোট বড় সব বিষয় লইয়াই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে দলীয় সাংসদদের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। সংসদের বাহিরেও কেন্দ্রের নীতি ও বিজেপির বিরোধিতা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জিএসটি বিলকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইয়াছিল কেন্দ্রের প্রতি তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার কারণ, আর্থিক দিক হইতে রাজ্যের বেহাল দশা এবং রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে টান পড়িবার আশঙ্কা।

মাহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি প্রাপকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাইতে চাহিতেছেন। ইহা নেত্রীর মনঃপূত নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয়তার দোহাই দিয়া আপত্তি করিয়াছেন। ঘটনা হইল, যে প্রকল্প সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের, যাহার পরিকল্পনা হইতে টাকার যোগান সবই কেন্দ্রের দায়িত্ব, তাহার টাকা রাজ্য সরকারের হাতে না আসিলে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ক্ষতি হইবে, এই দাবি আদৌ যুক্তসঙ্গত কি? নাকি বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা? বস্তুত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা রাজ্যে পৌঁছাইবার পরও তাহা পড়িয়া থাকে— রাজ্য সরকারের কর্মীদের বেতন দেওয়া ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে টাকাটা যাহাদের জন্য আসিয়াছিল, তাহাদের পাইতে বিলম্ব হয়। নরেন্দ্র মোদী সরকার এই ধারাটি বদলাইয়াছেন। চতুর্দশ অর্থকমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলির বরাদ্দ বহুলাংশে বাড়িয়াছে। রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্প রচনার, পরিচালনার ও তাহার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব এখন রাজ্যগুলিরই। এই বিষয়ে কেন্দ্রের বিরোধিতার তাই কোনো যুক্তিগ্রাহ্যতা নাই।

ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে, যেমন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান হইতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সেই দেশের যে সকল সংখ্যালঘু (পড়ুন হিন্দু) ধর্মীয় কারণে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, মোদী সরকার তাহাদের ভারতের নাগরিকত্ব দিতে চায়। এই কারণে সংবিধানের নাগরিকতা অধিনিয়ম-১৯৫৫ ধারাটি সংশোধন করিতে হইবে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া তৃণমূল এই আইন প্রণয়নের তীব্র বিরোধিতা করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তৃণমূলদল ও মুখ্যমন্ত্রীর বোঝা উচিত চোখ বুঁজিয়া প্রতি পদে কেন্দ্রের বিরোধিতা করা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র সরকারেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে। রাজনৈতিক স্তরে বিরোধিতা করা স্বাভাবিক, কিন্তু কেন্দ্র যদি রাষ্ট্রহিতের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা — এই নীতি কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না।

সুভাষিতম্

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।। (মুণ্ডকোপনিষদ)

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়। সত্যরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত আছে, যেখানে আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে গমন করেন, সেই দেবযান মার্গও সত্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত।

পাকিস্তানের মদতে বাংলাদেশের দুর্গম পাহাড়ে জঙ্গি আস্তানা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। ২০১৩-১৪ সালে বিএনপি- জামায়াতের জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচি সামলাতে ব্যস্ত ছিল বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সেই সুযোগে ওই সময় দেশের পার্বত্য এলাকা কক্সবাজারের টেকনাফ এবং বান্দরবানের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে সংগঠিত হয় পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা জঙ্গিরা। তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা, জামা-আতুল মুজাহিদিন ও পাকিস্তানি তালেবান। ভারত ও বাংলাদেশের শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সম্প্রতি এ তথ্য দিয়েছে মিয়ানমারের মিজিমা ডট কম-সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, ২০১২ সালে পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে এইসব রোহিঙ্গা জঙ্গি। বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারে গুপ্ত হামলাসহ নাশকতা সৃষ্টি করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এইসব জঙ্গির বেশিরভাগই সংগ্রহ করা হয় কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে। মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিম রাখাইন প্রদেশে গত ৯ অক্টোবরের নাশকতার পেছনে দেশটির রোহিঙ্গা মিলিশিয়াদের সংগঠন আকায়ামুল মুজাহিদিনকে (এএমএম) দায়ী করে সম্প্রতি এক বিবৃতি দেন মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট তিন কিয়াও। তাতে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সঙ্গে এএমএমের সুসম্পর্ক রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিন কিয়াও বলেন, মিয়ানমারের ভেতরে নাশকতার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে পাকিস্তানের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন। ১৪ অক্টোবর মিয়ানমার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে প্রচারিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ৯ অক্টোবরের নাশকতার ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি দলগুলোর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এএমএম-প্রধান হাফিজ তোহার (৪৫) একসময় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরে থাকত। তারপর সে পাকিস্তানে চলে যায়। সেখান থেকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখাইন অঞ্চলে নাশকতামূলক তৎপরতা শুরু করে।

বাংলাদেশ পুলিশের হাতে ধৃত রোহিঙ্গা জঙ্গি।

৯ অক্টোবর সকালে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলের মংডু শহরে তিনটি পুলিশ চেকপোস্টে হামলা করে জঙ্গিরা। এতে ৯ পুলিশ সদস্য নিহত হন। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পাল্টা হামলায় ২৬ জঙ্গি নিহত হয় বলে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর জানায়। জানা যায়, এএমএম প্রধান হাফিজ তোহার পাকিস্তানে জঙ্গি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এএমএম একটি নতুন জঙ্গিগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এদের পেছনে রয়েছে হরকাতুল জিহাদ ইসলামি-আরাকান (হুজি-এ) নামের পুরনো উগ্রবাদী সংগঠন। সংগঠনটির সঙ্গে পাকিস্তানি তালেবানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি জানান, হুজি-এ-এর প্রধান আবদুস কুদ্দুস বারামি। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে জন্ম হলেও পরে সে পাকিস্তানের নাগরিক হয়। তার সঙ্গে পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবা ও জামা আতুল দাওয়া সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সে-ই এএমএম প্রধান হাফিজ তোহারকে রাখাইন প্রদেশের মংডু শহরের কুয়েক পিয়াইন সেক গ্রাম থেকে বাছাই করে জঙ্গিবাদের দীক্ষা দেয়। তারপর প্রশিক্ষণ নিতে তাকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলেছেন, পরে এই হাফিজ তোহারই রাখাইন প্রদেশের এবং বাংলাদেশের কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরের উঠতি বয়সি ছেলেদের সংগ্রহ করে তাদের মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি দুর্গম জঙ্গলে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়। যারা মিয়ানমারের ভেতরে নানা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। এর পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের ভেতরেও এই জঙ্গিরা নানা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছে। মিজিমা'র আগের একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়, ২০১২ সালেই এই জঙ্গি সংগঠনগুলোর উসকানিতে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে, যা পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়। বহু প্রাণহানি হয় সেই দাঙ্গায়। এছাড়া চ্যানেল নিউজ এশিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করে। মুসলমান ধর্মাবলম্বী এই রোহিঙ্গাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাম্প্রদায়িক সংঘাত চলছে। ২০১২ সালে সংঘটিত দাঙ্গার পর প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। শুধু রোহিঙ্গাই নয়, মিয়ানমারের এরকম প্রায় ১৩৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে দেশটির বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বাংলাদেশ থেকে 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে বিবেচনা করে।

গোয়েন্দাদের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমে আরও বলা হয়, আবদুস কুদ্দুস বারামি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হুজি-এ নেটওয়ার্কের বিস্তার করে। সময়টি এমনভাবে বেছে নেওয়া হয় (২০১৩-১৪ সাল) যখন বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ব্যস্ত সময় পার করছিল জামায়াত ও বিএনপির নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করতে। সে সময় পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরাকানি জঙ্গিরা ঘাঁটি গাড়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে। সেখানে তারা আরাকান ও কক্সবাজার থেকে সংগ্রহ করা জঙ্গিদের কমব্যাট ট্রেনিং, বোমা বানানো ও ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। পরে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এরকম পরিত্যক্ত কিছু ঘাঁটি খুঁজে ও পান।

বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার এক শীর্ষ কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে মিজিমা জানায়, রোহিঙ্গা সঙ্কটকে ইস্যু বানাতে ২০১২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে 'দিফা-ই মুসলমান-ই আরাকান' নামে একটি সম্মেলন করে জামায়াত-উদ-দাওয়া ও লস্কর-ই-তৈবা। এরই ধারাবাহিকতায় সে বছরের আগস্টে গোপনে বাংলাদেশে আসে জামায়াত-উদ-দাওয়ার সক্রিয় সদস্য ও পাকিস্তানের নাগরিক সৈয়দ মাহমুদ ও নাদিম আওয়ান। তারা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে আরাকানি জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসরি যোগাযোগের একটি শক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ভারতের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জঙ্গিদের কেউ কেউ পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরে নাশকতামূলক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়েছে এমন প্রমাণও আছে। ২০১৫ সালের অক্টোবরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) কমান্ডার আদিল পাঠান ও ছোটা বারমি নামের দুই জঙ্গি নিহত হয়। এই ছোটা বারমি রোহিঙ্গা নেতা। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের একটি ছবিতে লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ নেতা হাফিজ মহম্মদ সাইদ ও কয়েকজন রোহিঙ্গা নেতার সঙ্গে তাকেও এক মঞ্চে দেখা গেছে। ভারতীয় ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আরও জানান, ২০১২ সালে বাংলাদেশের গোয়েন্দারা মাওলানা সাবির আহমেদ নামে পাকিস্তানভিত্তিক এক রোহিঙ্গা নেতাকে গ্রেপ্তার করে। পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মধ্যে দূতের কাজ করত সে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা জঙ্গিদের অবৈধ পথে অর্থ আনার দায়িত্ব ছিল তার। কুদ্দুস বারমির হুজি-এ-এর পাশাপাশি অন্য একটি রোহিঙ্গা জঙ্গিগোষ্ঠী বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় বেশ সক্রিয় বলে জানান ভারতীয় কর্মকর্তারা। মওলানা আবদুল হামিদ নামের এক রোহিঙ্গা এই নেটওয়ার্কের প্রধান, সেও পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবার সমর্থনপুষ্ট।

সংবাদমাধ্যম আরও জানায়, সব জঙ্গিগোষ্ঠীর পেছনেই রয়েছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সের (আইএসআই) হাত। পাকিস্তানেই সংস্থাটির একটি বিশেষ সেল রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয়ের কাজ করে। এছাড়া পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জঙ্গিদের সরাসরি প্রশিক্ষণ দিয়েছে এমন খবরও রয়েছে।

রোহিঙ্গা কমিউনিটির একটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে মিজিমা জানায়, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) প্রধান নূর হোসেইন আরাকানি। মূলত আরএসও হচ্ছে ওই অঞ্চলের জঙ্গি সংগঠনের মূল দল। নূর হোসেইন আরাকানে জঙ্গি কার্যক্রমের তহবিল সংগ্রহ করে জেইউডি/এলইটির হাফিজ মহম্মদ সাইদসহ পাকিস্তানের আরো কয়েকটি এনজিওর কাছ থেকে। সেগুলো পরে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ সরকার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে মিজিমার প্রতিবেদনে উল্লেখ করে বলা হয়, দলটি জঙ্গিবাদ রুখতে মিয়ানমারের প্রতি সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিনিয়োগকারীদের বিশ্ব সম্মেলনে গুজরাটের উপহার সন্তনগরী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রেনচাইল্ড সন্তনগরীর পরিকল্পনা সার্থক হতে চলেছে। গুজরাতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাটের' বিজ্ঞাপন হিসেবে তুলে ধরার জন্য সে রাজ্যের সরকার এখন ৫২৫ কোটি টাকার প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণে ব্যস্ত। উত্তর গুজরাটের সবরকণ্ঠ জেলার মাহোর গ্রামে এই প্রকল্পের জন্য ৪৩৯ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই প্রকল্পে একই সঙ্গে গৌতমবুদ্ধ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, গুরুগোবিন্দ সিং, সন্ত কবির এবং মইনুদ্দিন চিস্তির জীবন ও আদর্শকে এক ছাতের নীচে একত্রিত করা হবে।

প্রকল্পের কাজ শেষ হবে তিনটি পর্বে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মমতের মধ্যে স্বাভাবিক পরিসর তৈরি করা। উদ্যোগপতিদের বিশ্ব সম্মেলনে সন্তনগরী গুজরাটের অন্যতম মুখ হয়ে উঠতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। প্রকল্পের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানতে পারা গেছে।

প্রকল্পের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গুজরাটের পর্যটন, দেবস্থান ও তীর্থযাত্রা ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব হায়দর আলি বলেন, 'প্রকল্পটি কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় গড়ে তোলা হবে। আমরা ইতিমধ্যেই ১৭২ হেক্টর জমি হাতে পেয়ে গেছি।' প্রকল্পস্থলটি ধারোই জলাধার থেকে সাত কিলোমিটার দূরে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণ

মন্দির ও হিন্দুদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটতরাজ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় সাম্প্রদায়িক হামলায় ১৫টি মন্দির ও দুশোরও বেশি হিন্দুদের বাড়ি ঘরে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে। এ হামলায় আহত হয়েছেন পুরোহিতসহ শতাধিক নারী-পুরুষ। শিশুরাও হামলা থেকে রেহাই পায়নি। এ ঘটনার জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাশের জেলা হবিগঞ্জের মাধবপুরেও দুটি মন্দির ও কয়েকটি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর থানার কয়েকটি এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ করা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পবিত্র কাবা শরিফ নিয়ে কথিত এক অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার কারণে এ হামলা চালানো হয়। ২৯ অক্টোবর উত্তেজনা ও বিক্ষোভের মুখে নাসিরনগরের হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের রসরাজ দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিন্তু রসরাজ বলেছে, তার ফেসবুক পেজে ঢুকে অন্য কেউ ওই পোস্ট দিয়েছে। এলাকাবাসী বলেছে, প্রশাসনের উদাসীনতায় এ ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে হামলা প্রত্যক্ষ করেছে, কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফেসবুকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৯ অক্টোবর দুপুরের পর থেকেই উত্তেজনা ছড়ানো হয়, কিন্তু প্রশাসন গা করেনি। হামলার পর তিন প্লাটুন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি), দুই শতাধিক পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) মোতায়েন করা হয়। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, আপাতত পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। আর এ উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে।

দুষ্কৃতীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত মন্দির।

জানা গেছে, আগের দিন ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ৩০ অক্টোবর সকালে স্থানীয় ডিগ্রি কলেজ মোড়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক রিয়াজুল করিমের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় খেলার মাঠে খাঁটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি মহম্মদ মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হামলার শিকার হিন্দুরা জানিয়েছেন, ওই দুই সমাবেশে অংশ নেওয়া লোকজনই সমাবেশের পর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। উপজেলা সদর থানার আশপাশে দত্তপাড়া, পূর্বপাড়া, গাঙ্গলপাড়া, কাশীপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, সূত্রধরপাড়া, পশ্চিমপাড়া, মালিপাড়া, শীলপাড়া ও ঘোষপাড়ায় মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িঘরে চড়াও হয়ে লুটপাট ও ভাঙচুর করে তারা। হামলা চালায় ৫টি সার্বজনীন মন্দির ও ১০টি পারিবারিক মন্দিরে। শনিবার ছিল কালীপূজা ও দীপাবলী। মন্দিরগুলোর মধ্যে পশ্চিমপাড়ার জগন্নাথ মন্দির, নমঃশূদ্রপাড়ার কালী মন্দির, মহাকালপাড়ার শিব মন্দির ও দুর্গা মন্দির, শীলপাড়ার লোকনাথ মন্দির, দত্তপাড়ার দত্তবাড়ির মন্দির, সূত্রধরপাড়ার কালী মন্দির, গৌরমন্দির অন্যতম। মন্দিরের সেবায়েত ও ভক্তরা জানিয়েছেন, মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুরের পাশাপাশি ভক্তদের দেওয়া প্রণামীর টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ও পূজার উপকরণ লুট করে হামলাকারীরা। হামলাকারীরা পিটিয়ে গুরুতর আহত করে গৌরমন্দিরের সেবায়েত শঙ্কর সেনকে। হবিগঞ্জেও হামলা হয় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সমাবেশের পর। হামলা চালানো হয় ঝুলন মন্দির ও কালীমন্দিরে। আশেপাশের কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়।

নিরাপত্তা-গবেষণায় গতি আনতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দু'বছরের অবহেলার পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণায় গতি ফেরাতে উদ্যোগ নিল ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বি পি আর অ্যান্ড ডি)। অক্টোবরের গোড়ায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তিরিশটি বিষয় বেছে নিয়ে সংস্থাটি গবেষণা প্রকল্প আহ্বান করা শুরু করেছে। বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ভারত-পাক সীমান্তে প্রযুক্তির ও জম্মু-কাশ্মীরের সদস্যা নিরসনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বাড়ানো এবং অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পথসন্ধান।

ভারতের প্রতিটি রাজ্য, প্যারামিলিটারি ফোর্স এবং কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর অনুমোদিত বিষয়গুলির অন্যতম হলো, রাজস্থান গুজরাট জম্মু-কাশ্মীর এবং পঞ্জাবের সীমান্ত অঞ্চলে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানো যায় কিনা তাই নিয়ে ব্যবহারিক গবেষণা।

রাজ্যে সম্প্রতি দুর্গাপূজায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া আক্রমণ, রাজ্যের সীমান্ত জেলাগুলিতে হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান জেহাদি আক্রমণ এবং স্বয়ংসেবকদের ওপর তৃণমূল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের হামলার বিবরণ দিচ্ছেন গত ২৭ অক্টোবর কলকাতার কেশব ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। তাঁর বাঁ দিকে প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী এবং ডানদিকে প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়।

উবাচ

"ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রিলিজিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয় বরং প্রত্যেক রিলিজিয়ন-এর সঙ্গে সমান ব্যবহার। আমাদের জনজীবনে রিলিজিয়ন (উপাসনা-পদ্ধতি) এবং জাতিপ্রথা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। রিলিজিয়ন ও জাতি-ব্যবস্থা থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব কি?"

সুপ্রিম কোর্টের সাতজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত ডিভিসন বেঞ্চ

রাজনীতি থেকে রিলিজিয়নকে বিচ্ছিন্ন করা সম্পর্কে।

"দীপাবলী উৎসব এখন শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের সব দেশেই দীপাবলী পালিত হচ্ছে।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘে দীপাবলী পালন প্রসঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতে প্রধানমন্ত্রী

"সরকারকে প্রশ্ন করার অধিকার আছে। কিন্তু আসল প্রশ্ন এই, শহিদদের বদলে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বেশি ভাবনা কেন?"

কিরণ রিজিজু
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ভোপাল জেল থেকে ৮ সন্ত্রাসবাদীর পালিয়ে যাওয়া ও তাদের মৃত্যুর ঘটনায় কিছু নেতার প্রশ্ন তোলা প্রসঙ্গে এক ট্যুইট বার্তায়।

"পাকিস্তান শান্তির ভাষা বোঝে না। তা বোঝানোর জন্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক খুব জরুরি।"

পাকিস্তানের সন্ত্রাসে মদত প্রসঙ্গে।

নাইলা কাদরি বালুচ
বালুচ মুক্তি সংগ্রামী

"ভারত আমাদের সবচেয়ে কাছের। তারা যদি আমাদের বেদনা না বোঝে, তাহলে আর কে বুঝবে?"

বালুচিস্তানে পাকিস্তানের দমনপীড়ন প্রসঙ্গে।

বুগতি
বালুচ মুক্তি আন্দোলনের নেতা

নারী ও শিশু পাচার চক্রের বড় কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ

মাধবী মুখার্জী॥ আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক নারী ও শিশু পাচার চক্রের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিভিন্ন জেলা থেকে শিশু ও মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লী, মুম্বই, পঞ্জাব, হরিয়ানা কাশ্মীর যা আবার অন্য রাজ্যে বা রাষ্ট্রে পাচার করা হয়। নারী মুক্তির স্লোগানকে পিছনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ মসৃণভাবে হয়ে উঠেছে বত্রিশ বিলিয়ন ডলারের বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলা অপরাধ বাণিজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিমবঙ্গে পাচার হওয়া দুই তৃতীয়াংশ শিশুই হলো বালিকা। এদের মধ্যে নব্বই শতাংশই হয় প্রাথমিক স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়েছে বা কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পায়নি। এতে বোঝা যায় পাচার হওয়ার সঙ্গে শিক্ষার একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা একক পাচারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি ও হাওড়া এই শহরগুলি নারী ও শিশু পাচার হয়ে যাবার বড় কেন্দ্র। রাজ্যের গ্রামের বিস্তৃত অঞ্চলে দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা এখনও রয়ে গিয়েছে। সেখানে লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে, রয়েছে গার্হস্থ্য হিংসার পরিবেশও। এই দারিদ্র্যপীড়িত সামাজিক ক্ষেত্র যেখানে জীবনধারনের জন্য স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা নেই। এসব জায়গা পাচারকারীদের শিকার ধরবার আদর্শ জায়গা। এই রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। এ রাজ্য শুধু আন্তঃরাজ্যে পাচার নয় বরং আন্তর্জাতিক পাচারের করিডোর বা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত।

নারী ও শিশু পাচার এখন অন্যতম মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে, যে কারণে নারী ও শিশু পাচারের

সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়েছে। এটি শুধু রাজ্যের সমস্যা নয় বরং গোটা বিশ্বে এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ বহুমুখী ও জটিল। ধনী বা গরিব দেশ নির্বিশেষে এই সমস্যার শিকার হচ্ছে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়।

নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে এক ধরনের সহিংসতা যা মানব সভ্যতার প্রতি উপহাস, বর্বর যুগের প্রতিচ্ছবি। মানবিক মূল্যবোধ অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করার নিদর্শনের এক করুণ প্রতিচ্ছবি। বিশ্বজুড়ে মানব পাচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কারণে এই সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সব নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে পাচারকারীর দলের মানসিকতার অবস্থানকে লক্ষ্য রেখে শক্তিশালী প্রতিরোধের উপায় খুঁজতে হবে।

নারী ও শিশু পাচারের প্রধান কারণগুলো অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। আইনগত দুর্বলতার সুযোগ, নীতি ও অনুশাসনের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও শিক্ষার অভাব এবং তা প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব এবং সর্বোপরি প্রতিকারের জন্য আইনি সহায়তার সীমিত সুযোগ নারী ও শিশু পাচারের অন্যতম কারণ।

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে রাজ্যের পুলিশের প্রচলিত আইনই যথেষ্ট। নারী ও শিশু পাচার একটা গুরুতর অপরাধ, এমন ঘটনা ক্রমাগত ঘটতে থাকলে ধরে নিতে হবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ততটা আটোসাটো নয়, যে কারণে দুষ্কৃতীরা এই ধরনের অপরাধ করার সুযোগ পাচ্ছে। অপহরণ, পাচার, ধর্ষণের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলার অন্যতম কারণ হলো এই ধরনের মামলার সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢিলেমি। শুধু ধর্ষণ, পাচার, অপহরণের মামলাতেই নয়, সার্বিকভাবে সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রেই সাজা দেওয়া ব্যাপারে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া প্রশাসনের ব্যর্থতা, তদন্তে ধীরগতি, বিলম্বিত বিচার-প্রক্রিয়া এবং নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অপহরণ, পাচার, ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজ। আইনি দুর্বলতার কারণে জামিন অযোগ্য ধারায় জড়িত অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলেই দেশে এই ধরনের অপরাধের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অপহরণ পাচার এবং ধর্ষণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর এবং ঘৃণিত অপরাধ ধর্ষণের ঘটনাও পাল্লা দিয়ে ঘটেছে। অথচ এ ধরনের অভিযোগ থাকার পরও অনেক আসামি বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে।

সমাজ এগোচ্ছে, মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে তবুও মেয়েরা হচ্ছে অপহৃত, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা। আজও আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয় শিশু দিবস, নারী দিবস। কিন্তু এখন দিবস পালনের মাধ্যমে কতটা কমেছে নারী ও শিশু অপহরণ, পাচার, নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ?

সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য গলা ফাটালেও শুনবে কে? পরিণতি--- ? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ■

কেন্দ্রকে হিংসা করতে হবে, তবেই রাজ্যের উন্নতি

প্রিয় সরকারি কর্মীগণ,

চলতি বছরে দু'বার ডিএ বাড়াল কেন্দ্র। ১ জানুয়ারি থেকে বাড়ে ৬ শতাংশ আর এবার বাড়ল ২ শতাংশ। মাঝে রাজ্য ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ানো সত্ত্বেও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ফারাক কমেনি। বকেয়া মহার্ঘভাতা বেড়েই চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের।

কিন্তু শুধু ডিএ বৃদ্ধিই নয়, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের যে বেতন কাঠামো তাতে রাজ্যে একই পদমর্যাদার কর্মী হাতে পান অর্ধেক টাকা। কয়েক মাস আগেই সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর তাতে যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আর্থিকভাবে আপনারা রাজ্য সরকারি কর্মীরা রীতিমতো লজ্জাজনক জায়গায়।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ায় সব স্তরের কর্মীর মূল বেতন ২.৫৭ গুণ বেড়েছে। ন্যূনতম মূল বেতন ৭ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮ হাজার টাকা। মূল পেনশন বেড়েছে ২.৫৭ গুণ। পুরনো মূল বেতন ও ১২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা মিলে তৈরি হয়েছে নতুন মূল বেতন। ফলে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশের কাছাকাছি। উপকৃত হয়েছেন ১ কোটি কর্মী ও পেনশনভোগী।

এ রাজ্যে এক জন গ্রুপ ডি কর্মী চাকরি শুরুর সময়ে বেতন পান মোটামুটি সাড়ে ১২ হাজার টাকা। সেখানে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারি একজন গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বেতন পাচ্ছেন ২২ হাজারের মতো। এবার দেখা যাক, রাজ্য ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঘোষণা করেন, বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে অক্টোবর মাসে ষষ্ঠ পে কমিশন গঠন হবে। কমিশন কবে তাদের সুপারিশ জমা দেবে, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, সাধারণ ভাবে পে কমিশন গঠনের পরে তার সুপারিশ কার্যকর করতে দেড় থেকে দু'বছর সময় লেগে যায়। সেই হিসেবে ২০১৭ সালের আগে রাজ্য সরকারি কর্মীদের নতুন বেতন কাঠামো সম্ভব নয়। তবে নবান্নে সূত্রে খবর, আরও সময় নেবে রাজ্য সরকার। অর্থের সংস্থান না থাকাতেই আরও সময় নেবে। আশা করা হচ্ছে, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের কাছাকাছি সময়ে গিয়ে কার্যকর হতে পারে বেতন কমিশনের সুপারিশ। রাজ্যে অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে গঠিত ষষ্ঠ বেতন কমিশন এখনও পর্যন্ত সেভাবে কাজ শুরুই করতে পারেনি বলেই খবর। নবান্ন সূত্রে খবর, আর্থিক সঙ্গতি না থাকাতেই কমিশন নিয়ে 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছে সরকার। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই এই 'ধীরে চলো' নীতির কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাম আমলে ২০০৯ সালে রাজ্যে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে কর্মীদের বেতন ও পেনশন বৃদ্ধি হয়েছিল গড়পড়তা ৬০ শতাংশ। কিন্তু এখন কেন্দ্রের যা বেতন কাঠামো তার সঙ্গে বেতনবৃদ্ধির সমতা রাখতে গেলে প্রায় ৮০ শতাংশ বেতন বাড়াতে হবে রাজ্যকে। কিন্তু তেমনটা কি আদৌ সম্ভব?

অতটা আশা করছেন না রাজ্য সরকারি কর্মীরাও। ৩০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হলেই অনেক বলে মনে করছেন তাঁরা। নবান্নের হিসেব বলছে, এখনই বেতন-পেনশন দিতে খরচ হয় বছরে প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকা। নতুন হারে বেতনবৃদ্ধি কার্যকর করতে হলে ২০১৯-'২০ সালে গিয়ে সরকারের অতিরিক্ত খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৮৩ হাজার ৬২৪ কোটি টাকা। ওই চার বছরে ঋণের সুদ ও আসল মেটাতে খরচ হবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা।

কিন্তু এত টাকা আসবে কোত্থেকে? বর্ধিত বেতনের দায় দিল্লীর ঘাড়ে চাপাতে চেয়ে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের কাছে টাকা চেয়েছিল রাজ্য সরকার। চার বছরের জন্য সব মিলিয়ে অতিরিক্ত প্রায় ৮৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার দাবি করে রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল, কেন্দ্র সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছে বলেই চাপে পড়ে রাজ্যকে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করতে হয়েছে। তাই বর্ধিত বেতন-কমিশনের যাবতীয় আর্থিক দায় কেন্দ্রকেই বহন করতে হবে। কমিশন অবশ্য রাজ্যের ওই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। কারণ কোনো রাজ্যকেই এমন সুযোগ দেয় না কেন্দ্র। উল্টে অর্থমন্ত্রক জানায়, রাজ্য সরকারকেই নিজেদের রাজস্ব আয় বাড়িয়ে এবং খরচের লাগাম টেনে বেতন বৃদ্ধির চাপ সামলাতে হবে।

২০০৯-'১০ সালে পঞ্চম বেতম কমিশনের সুপারিশ মানতে গিয়ে রাজ্যের খরচ বেড়েছিল প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা। সেই ধাক্কা সামলাতে বাজার থেকে দেদার ঋণ নেয় বাম সরকার।

এই মেয়াদি ঋণের সুদ দিতে হচ্ছে এখন। আসল শোধ শুরু হবে ২০১৭-'১৮ সাল থেকে। ফলে সেই সময়ে এক দিকে বিপুল পরিমাণে ঋণ শোধেই রাজ্যের কোষাগার উজাড় হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে বেতন কমিশনের জেরে বাড়তি দায় চাপবে রাজ্যের ঘাড়ে। তবু ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর করতে পারে বলেই আশায় রয়েছেন সরকারি কর্মীরা।

—সুন্দর মৌলিক

পাকিস্তানের জম্মু-কাশ্মীর দখল দিবাস্বপ্ন মাত্র

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত)

বহু বছর যাবৎ পাকিস্তান জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করে ভারতে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। মুম্বই ২৬/১১ থেকে পাঠানকোট, তারপর উরি, বারমুল্লা ইত্যাদি। যদিও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলেন, পাক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে মিত্রতার বার্তা দিয়েছিলেন। পরেও বহুবার সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যক্তিগত প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান এই প্রচেষ্টা ভারতের দুর্বলতা বলেই মনে করেছে। অস্ত্রবিরতি রেখা উল্লঙ্ঘন করে ভারতে, বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণ রেখার নিকটে সাধারণ গ্রামগুলিতে গোলাবৃষ্টি, অস্ত্রপ্রহার করে চলেছে।

জেনারেল রহিল শরিফ বার বার রণহুংকার দিয়েছেন 'আমাদের পরমাণু অস্ত্র আছে' বলে। অর্থাৎ ভারত যদি প্রত্যাঘাত করবার সাহস করে তাহলে পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রাঘাত করতে দ্বিধা করবে না। একদিন ভারতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সমস্ত বিশ্ববাসী জেনে গেল, পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে ছয়টি টার্গেটে ভারতের সামরিক বাহিনী সার্জিক্যাল অপারেশন করে যেসব জেহাদি সন্ত্রাসবাদী ভারতে অনুপ্রবেশ করে সন্ত্রাস ঘটানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের আঘাত করেছে। সামরিক বাহিনীর কেউ হতাহত হয়নি। অনেকেরই প্রশ্ন, সার্জিক্যাল অপারেশনটা কী ব্যাপার? এই কথাটি শল্যচিকিৎসার বিষয় হলেও সামরিক বাহিনীতেও বহুল ব্যবহার হচ্ছে। আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে অথবা গলব্লাডারে পাথর থাকলে বুকে বড়সড় ছিদ্র করে অথবা পেট কেটে ওই চিকিৎসা করা হোত। বর্তমানে শল্যচিকিৎসায় এত উন্নতি হয়েছে যে মাত্র দু-একটা ছিদ্র করে রুগিকে সুস্থ করা হচ্ছে। এর দ্বারা শরীরের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনো আঘাত বা ক্ষতি হয় না। দ্রুত রোগ নিরাময় হয়। সামরিক বাহিনীও কোনো টার্গেটে আঘাত করার প্রয়োজন হলে নিঃশব্দে টার্গেটের উপরই শুধু আঘাত করে সবার অলক্ষ্যে ফিরে আসতে পারে। আশেপাশের কোনো এলাকায় এই আক্রমণের প্রভাব পড়বে না (কোল্যাটারাল ড্যামেজ)। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের বিষয় আক্রমণকারীদের কেউ যাতে হতাহত না হয় তা নিশ্চত করাও সার্জিক্যাল অপারেশনের বৈশিষ্ট্য। ভারত বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে, এই আক্রমণ শুধু নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারেই করা হয়েছে আত্মরক্ষার তাগিদে। পাকিস্তান এই অপারেশনের কথা স্বীকার করেনি। তাদের বক্তব্য, নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে শুধু গোলাগুলি চালনা করা হয়েছে।

মাত্র কয়দিন আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভারত নাম না করেও পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিল। জয়েস-ই-মুহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করারও প্রয়াস করেছিল। অন্য সমস্ত রাষ্ট্র এ বিষয়ে একমত হলেও পাকিস্তানের প্রাণের বন্ধু চীন ভেটো প্রয়োগ করে।

এই সার্জিক্যাল অপারেশন পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের জুজুকে অবাস্তব প্রমাণিত করে দিয়েছে। কারণ সকলেই জানেন পরমাণু অস্ত্র কোনো যুদ্ধাস্ত্র নয়। বরং যুদ্ধ নিরোধক অস্ত্র। পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগে অসহনীয় ধ্বংসলীলাই সাধিত হয়। এই সার্জিক্যাল অপারেশনের পর পাকিস্তান জম্মুর বিপরীতে কাথুয়া, হীরানগর, আকনুর অঞ্চলে এবং উড়ি, তাংধারে প্রচণ্ড গোলাগুলির প্রহার আরম্ভ করেছে। ভারত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে সমস্ত গ্রামবাসীকে দশ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তবুও বেশ কিছু সাধারণ মানুষ হতাহত হয়েছেন। সীমান্ত সুরক্ষা দল এবং সামরিক বাহিনীকে ভারত সরকার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে ওপারেও যে হতাহত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তান রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, ভারত অকারণ একতরফা পাকিস্তানের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করছে এবং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় বসতে চাইছে

পূর্ণকালীন কার্যকর্তা চাই
গো-ভিত্তিক গ্রাম বিকাশের জন্য

গো-সেবা পরিবার গ্রাম বিকাশের জন্য গো-ভক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পূর্ণ সময় দিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এই কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। গো-সেবা পরিবার থাকা ও সেবানিধির ব্যবস্থা করবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।

গো-সেবা পরিবার

৫২৪ বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৩

ফোন নং - ৯৩৩১০২৭৪৭১

(ADVT.)

না। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচনা ও জনমত গ্রহণের প্রক্রিয়া (প্লেবিসাইট) গ্রহণ করা হোক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, সিমলা চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিবাদের মীমাংসা করা উচিত। চীনও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপদেশ দিয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তানের সমস্যা অন্যত্র। পাক সামরিক বাহিনী নওয়াজ শরিফ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের বিষয়ে যে-কোনো সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করবে, এ ব্যাপারে নির্বাচিত সরকারের কোনো এক্তিয়ার নেই। সার্জিক্যাল অপারেশনের সত্যতা অস্বীকার করার একটা কারণ পাকিস্তান তার নাগরিকদের এত বছর বুঝিয়ে এসেছে ভারত দুর্বল রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের হাতে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। ফলে ভারত প্রত্যাঘাত করার মতো সাহস দেখাবে না। মুখ রক্ষার জন্য তাই এই অস্বীকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এ বিষয়ে চিন্তিত। যদি পাক-পরমাণু অস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে যায়, তাহলে তারা কীভাবে ওই অস্ত্র ব্যবহার করবে, কোনদিকে তাক করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সকলের মনেই একটা প্রশ্ন, সীমান্তের এই ঘাত-প্রতিঘাত কি সীমান্ত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? উভয় দেশই পরমাণু অস্ত্রধর, পাকিস্তান যদি ওই অস্ত্র ব্যবহার করে ভারত চুপ করে বসে থাকবে না। জল, স্থল, আকাশ এবং জলতল থেকে অস্ত্র চালনার ক্ষমতা ভারতের আছে। ভারত অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হলে পাকিস্তান মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। অতএব বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এই সংঘাতকে যুদ্ধের আকার নিতে দেবে না। হস্তক্ষেপ করবে। যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের কিছুই হারাবার নেই। অপরের আর্থিক সাহায্যে তাদের দেশ চলছে। কিন্তু ভারতের অনেক কিছু হারাবার আছে। প্রথমত, উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। শিল্প সংস্থার অপরিসীম ক্ষতি হবে যা ভারতকে অন্তত ২৫ বছর পিছনে নিয়ে যাবে। সেজন্য ভারত যুদ্ধ চায় না। পাকিস্তান এটা জানে, সেই কারণে সে নিরন্তর ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ছায়া যুদ্ধের সৈনিক হলো

> **পাকিস্তান যদি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করে ভারত চুপ করে বসে থাকবে না। জল, স্থল, আকাশ এবং জলতল থেকে অস্ত্র চালনার ক্ষমতা ভারতের আছে। ভারত অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হলে পাকিস্তান মানচিত্র থেকে মুছে যাবে।**

জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা যাদের পাকিস্তান ‘ননস্টেট অ্যাক্টর’ বলে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

১৯৭১-এ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পিছনে পাকিস্তান ভারতকেই দায়ী করে। সেই ক্ষতির কিছুটা পূরণ করার জন্য জম্মু-কাশ্মীর তাদের চাই-ই চাই। তারা কাশ্মীরে বহু সংখ্যায় তাদের সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ করিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবান্বিত করছে এবং যারা ইদানীং অনুপ্রবেশ করছে, তাদের আশ্রয়, গাইড ইত্যাদির প্রয়োজন মেটাচ্ছে। সম্প্রতি দু'জন বারমুল্লায় ধরা পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত প্রহরা নিশ্ছিদ্র করতে হবে এবং গোয়েন্দা বাহিনী আরও জোরদার করতে হবে। মনে হয়, পাকিস্তান ২৬/১১ অথবা উরির মতো আরেকটা আঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, ভারতকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে আবার ধমক দিয়েছে, তারা কেন আই এস আই-এর সুরক্ষায় থাকা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিশেষ করে হাক্কানি তালিবানদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার নিজেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার ফলে লোকদেখানোর মতো পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের নিয়ন্ত্রণরেখায় বহু সৈন্য জড়ো করেছে। তাদের বিশেষ লক্ষ্য কাথুয়া হীরানগর অঞ্চল, যেখানে তাদের গোলাবর্ষণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ওই অঞ্চলে তারা একবার সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করেছিল, আবারও কি তারা ওই পথে হাঁটছে? এই অঞ্চল দিয়ে অনুপ্রবেশ সারা বছরই করা সম্ভব। ভারতকে কি আর একটা সার্জিক্যাল স্টাইকের পরিকল্পনা করতে হবে?

যুদ্ধ কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই কাম্য নয়। কিন্তু যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভারতকে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। ভারত কূটনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তানকে চাপে রেখেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রনীতির ধারক ও বাহক মনে করে। এই সংঘাত কীভাবে শেষ হবে ভবিষ্যৎই বলবে। তবে পাকিস্তানকে জম্মু-কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার স্বপ্নদেখা বন্ধ করতে হবে। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক : ভারতীয় বিদেশনীতির সাবালকত্ব প্রাপ্তি

প্রণয় রায়

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে ভারতবর্ষে ঘরোয়া রাজনীতিতে যতই জলঘোলা হোক, বিশ্বরাজনীতিতে কিন্তু এটা ভারতবর্ষকে এক ধাক্কায় অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছে। প্রায় ১০০০ বছর পর ভারতবর্ষ নিজের সীমান্ত টপকে কাউকে প্রত্যাঘাত করেছে। তাও লুকিয়ে লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যে বুক চিতিয়ে। বিজয় ডঙ্কার সঙ্গে বিশ্ববাসীকে ডিজিএমও লেঃ জেঃ রণবীর সিং যে ঘটনা সবিস্তারে জানিয়েছেন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক যেমন ভারতীয় সেনার ইতিহাসের স্বর্ণময় অধ্যায় তেমন বিদেশমন্ত্রকের সাবালকত্ব প্রাপ্তির প্রথম ধাপ বলেও অনেকে মনে করছেন। ভারতীয় সেনার কৌশল, দৃঢ়তা ও সাহস প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের সম্ভ্রম আদায় করেছে। আবার যে চাতুর্য যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রক পাকিস্তানকে এক ঘরে করে দিয়েছে বিশ্বকূটনীতির মহলে— এই ঘটনাও শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এবার ভারতবর্ষ নেহরু যুগ থেকে বেরিয়ে এসে নিজ দেশানুকূল বিদেশনীতির ভিত্তি স্থাপন করবে বলেও অনেকের মন্তব্য। যে বিদেশনীতির উদ্দেশ্য নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখা, শুধু নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থই দেখা।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হওয়ার পর একটি দেশও কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি। বরং ভারতের পক্ষেই দাঁড়িয়েছে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে পাকিস্তান নিজেও সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি, বরং পুরো ঘটনাটাই তারা অস্বীকার করে নিজেদের নাক বাঁচানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এবার একটু দুই দশক পেছনে ফিরে যাওয়া। ১৯৯৮ সালে ভারতে পরমাণু পরীক্ষার পরবর্তী দিনগুলিতে একের পর এক দেশ আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিল, ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য একের পর এক বাধা নিষেধ আরোপ করেছিল। উপমহাদেশে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টির প্রধান দোষী ভারতকে সাজানো হয়েছিল। সারা বিশ্বের সমবেদনা তখন পাকিস্তানের দিকে। হরেকরকম সাহায্য নিয়ে তারা পাকিস্তানে হাজির। সদ্য ক্ষমতায় আসা সংখ্যালঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বহু কষ্টে সেই অবস্থা থেকে দেশকে বের করে আনেন। আবার ১৯৯৯-তে কার্গিল যুদ্ধে ভারতবর্ষ আক্রান্ত কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে যেভাবে ভারতবর্ষ কূটনীতিক জালে বেঁধে রেখেছিল তা এককথায় অভূতপূর্ব। দুই বছরের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজী বুঝেছিলেন এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানো মানে দেশের অর্থব্যবস্থাকে জেনে শুনে কোমায় পাঠানো। ফলে তিনি মুখ বুজে দেশের ভেতরে-বাইরের সমালোচনা সহ্য করেছেন। এর পরেই অটলবিহারী আক্রমক কার্যশীল বিদেশনীতির ভিত্তি গড়ে তোলেন। প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী ভারত-ইজরাইল কূটনীতি সম্পর্কে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। ভারত-আমেরিকা সৈন্য সোমঝোতা, ব্রিকস্-এর গঠন সহ নানা পদক্ষেপ বিশ্বে ভারতের জোরালো উপস্থিতি তুলে ধরে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক সেখান থেকেই আবার শুরু করলেন। তাঁর অক্লান্ত বিদেশ সফর, বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের নিজ দেশে অভ্যর্থনা ভারতবর্ষের কূটনীতিক দরকষার ক্ষমতা বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। এজন্য তাঁকে দেশের মধ্যে বহু সমালোচনা শুনতেও হয়েছে কিন্তু তিনি থামেননি। দু' বছরের শাসনকালে তিনি প্রায় অর্ধশত দেশে সফর করেছেন এবং প্রায় আশির বেশি দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা সমপর্যায়ের উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধিমণ্ডল ভারতবর্ষে এসেছে। ফলে বর্তমানে পাকিস্তান একঘরে।

দপ্তরের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ।

একথা শুধু ভারত বলছে না, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে এই প্রশ্ন উঠেছে। পাকিস্তানের পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে বিরোধীদল পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতার মন্তব্য— 'পাকিস্তানের বিদেশনীতি এত দুর্বল কেন? আমরা এতটা একা হয়ে যাচ্ছি কেন? আর্মি, আই এস আই-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর গোপন বৈঠকে নওয়াজ শরিফের ভাই ও পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ খানের সরাসরি অভিযোগ, 'আই এস আই-এর জন্য আমরা বিশ্বে একঘরে হয়ে পড়েছি।' ঘটনাটি ডন পত্রিকায় ফাঁস করেছেন সাংবাদিক শিরিল অলমিতা। ভারতীয় কূটনীতিক মহল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সক্রিয় হয়ে ওঠেছে। তারা সেখানকার সরকারকে ভারতের অবস্থান বোঝাতে সক্রিয় হয়। প্রায় ২০টি শক্তিশালী দেশকে আলাদা ভাবে বোঝানোর দায়িত্ব স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে রাখেন। সারারাত জেগে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও তার সাফল্যের পর বিশ্বনেতাদের সাফল্যের সঙ্গে ভারতের অবস্থান বোঝানোর পর যখন প্রধানমন্ত্রী বিশ্রাম নিতে গেলেন, ঠিক তখনই ডিজিএমও সগর্বে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতের সাফল্যের সঙ্গে করা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের বর্ণনা দিচ্ছেন। বিদেশমন্ত্রকেও তখন সাফল্যের হাওয়া। বিশ্বের একটা দেশও ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদেশমন্ত্রকের এক সিনিয়ার অফিসারের কথায়— 'আমার চাকরি জীবনের সবচেয়ে ব্যস্ততম দিন ছিল সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরের সকাল। আর শুধু আমার কেন এটা ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের ব্যস্ততম দিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বোধহয় প্রথমবার এত আক্রামক বিদেশনীতির সূচনা করল কোনো দেশ। বিশ্বের ছড়িয়ে থাকা বিদেশমন্ত্রকের অফিসারদের বলা হয়েছিল তারা সেই দেশের সরকারকে বোঝাক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে হয় তারা ভারতকে সমর্থন করুন নয় বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য থেকে বিরত থাকুক, কোনো অবস্থাতেই যেন ভারতের বিরুদ্ধে কেউ মুখ না খোলে। এবং আমরা তাতে সাফল্যও পেয়েছি।'

বিদেশমন্ত্রকে সদ্য নিযুক্ত অন্য এক অফিসারের কথায়, প্রতিরক্ষমন্ত্রক রাত্রে পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করল আর বিদেশমন্ত্রক করল ভোরের আলো ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। বিকেলে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রককে চমকে দিয়ে বাংলাদেশ স্পষ্ট ভাষায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে সমর্থন করল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রধান পরামর্শদাতা ইকবাল চৌধুরী বলেন, নিজ ভূমি রক্ষার অধিকার ভারতবর্ষের রয়েছে। এবার বোমা ফাটান আফগান রাজদূত সাইদা আবদালি। তিনি বলেন ভারতের আরও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা উচিত। ভারতের সমর্থনে এগিয়ে আসে ভুটান-সহ বহু দেশ। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেসজারদ কেজারানস্কি বলেন, 'ভারতের সীমান্ত পার করে সন্ত্রাসবাদীদের উপর হামলা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনে প্রাপ্ত।' ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের পদস্থ কর্তারাও হয়তো এতটা আশা করেনি। চীনা বিদেশমন্ত্রকের প্রবক্তা জেন সাঙ্গ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রুটিন বক্তব্য জারি করে ভারত-পাকিস্তানকে দ্বিপাক্ষিক বার্তা চালানোর কথা বলে দায় সারে। পাকিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে চলা সৈন্য মহড়াকে সামনে রেখে নিন্দুকেরা বলেছিল ভারত হয়তো তার দীর্ঘদিনের মিত্রদেশকে এবার হারাল। রাশিয়ার অবস্থান বিদেশমন্ত্রককে কিছুটা হলেও প্রাথমিকভাবে হতাশার মেঘ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজেন্ডার এম কাদাকিনের সাফ কথা, 'প্রতিটি দেশের নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে, ভারতবর্ষ তার বাইরে নয়।' ফলে সে মেঘও কেটে যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে সেনা মহড়া সম্পর্ক তিনি বলেন, 'কোনো অবস্থাতেই এই মহড়া পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে হচ্ছে না।' প্রথমে আমেরিকা স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বনেতার মতো দুই দেশকে জ্ঞান দিয়ে দায় সারে। সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা (এন এস এ) সুসান বাইস ভারত এবং পাকিস্তানের এন এস এ-এর সঙ্গে কথা বলে উত্তেজনা কমানো, সন্ত্রাসবাদের উপর লাগাম কষার কথা বলেন। এই আমেরিকাই আবার স্ট্রাইকের দুই সপ্তাহ পর সরাসরি ভারতের পক্ষে দাঁড়ায়। মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মার্ক টোনার বলেন, নিজেকে রক্ষা করার অধিকার ভারতের রয়েছে। পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞদের মতে আমেরিকার এই ভোল বদল ভারতের আক্রামক বিদেশনীতির প্রত্যক্ষ ফল।

ইতিমধ্যে ইসলামাবাদ সার্ক সম্মেলনকে ভারত-সহ আরও পাঁচটি দেশ বয়কট করে। ফলে সার্ক সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক যেন রেকর্ড ভাঙার খেলায় নেমেছে। ১৫-১৬ অক্টোবর গোয়ায় অষ্টম ব্রিকস্ সম্মেলনের সফল আয়োজন বিশ্বে ভারতের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে। পাঁচটি দেশের এই সম্মেলনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন, চীনা রাষ্ট্রপতি জিপিং, ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি টেমার, দক্ষিণ আফ্রিকার

গোয়ায় ব্রিকস্ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী।

রাষ্ট্রপতি জেকব জুমা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী অংশ গ্রহণ করেন। সবাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ভারতের আগ্রহে একই জায়গায় BIMSTEC দেশগুলির সম্মেলনও আয়োজিত হয় সেখানেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী টবগে, মায়নমারের প্রধানেত্রী ও বিদেশমন্ত্রী আং সান সু কি, নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কুমার দহল, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি সিরিসেনা ও থাইল্যান্ডের মন্ত্রী ফুটরাকুল অংশ নেয়। সম্মেলন শেষের ১০ দিনের মাথায় ভারত ভ্রমণে আসেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী।

ভারতীয় সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর এতগুলি রাষ্ট্রনেতার ভারত ভ্রমণ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, অক্টোবর ২০১৬ ভারতীয় বিদেশনীতির যুগান্তকারী অধ্যায়। শুধু অক্টোবর মাসে যতগুলি দেশের রাষ্ট্রনেতা ভারতের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমাদের দেশে এসেছে সেখানে বিশ্ব জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করে। বিদেশমন্ত্রকের চমক এখানেই থেমে থাকেনি। তুর্কির রাজধানী ইস্তানবুলে আয়োজিত ৫৭টি দেশের অরগানাইজেসন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন-এর সম্মেলনে পাকিস্তানের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব নেওয়া হয়নি যা এক কথায় ম্যাজিক। কারণ সংগঠনটির সম্মেলন থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করানো পাকিস্তানের রেওয়াজ। এমনকী দুই ঘোষিত শত্রু সৌদি আরব ও ইরান এখন ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতের সঙ্গে সৌদি আরবের সৈন্য সমঝোতা এখন বহু আলোচিত বিষয়। ইরানের চারবাহা বন্দরের উন্নয়ন ঘটিয়ে ভারত গোয়াদর বন্দরে চীনের গুরুত্ব অনেকাংশে কমাতে বাধ্য হয়েছে। জাপান তো এক কাঠি এগিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরের চীনা আগ্রাসনকে রুখতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে চীন ছাড়া সবকটি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মধুর। মালেশিয়া, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলি চীনকে রুখতে ভারতে সহযোগী হতে উদগ্রীব। এক কথায় বলতে গেলে, এই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক শুধু ভারতীয় সেনা বাহিনীকেই চাঙ্গা করে তোলেনি, ভারতীয় বিদেশমন্ত্রককেও নেহরু যুগ থেকে টেনে বের করেছে। নেহরু যুগের ভুল বিদেশনীতির বহু মূল্য আমরা দিয়েছি। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য না হয়ে, তিব্বত দখলের সময় হিন্দি চীন ভাই ভাই করে, কাশ্মীর সমস্যাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে টেনে নিয়ে গিয়ে ও কাশ্মীরের বড় ভাগ পাকিস্তান- চীনের কাছ থেকে উদ্ধার না করে, ডব্লউ টি ও-তে চীনকে প্রবেশ পথ করে দিয়ে— আরও অনেক বলা যায়।

পুরো ঘটনায় ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের উপরি পাওনা বালুচনেতা শের মহম্মদ বুগতির আহ্বান। তিনি ভারতকে আরও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করার প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ডন পত্রিকায় লেখা একটি প্রতিবেদনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের প্রাক্তন রাজদূত মুনির সার্জিক্যাল স্টাইক সরাসরি স্বীকার করে নিয়েছেন— এই মুহূর্তে তুর্কি ও চীন ছাড়া পাকিস্তানের কোনো মিত্র নেই। সবশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী আগামী তিন মাসে দুনিয়ার ৬৮টি দেশে সফর করবেন কেন্দ্রের নানা মন্ত্রী। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, বিশ্বের এমন ৬৮টি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলির সঙ্গে গত দু'বছর যাবৎ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ কোনো যোগাযোগ হয়নি। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যভুক্ত ১৯২টি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হবে ভারতের। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার লড়াইয়ে ভারত অনেকটাই এগিয়ে যাবে বলে বিদেশমন্ত্রকের আশা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এগোচ্ছেন বলে কূটনীতিক মহলের খবর। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

চীন-পাকিস্তান বাঁচলে দেশের নাম

অভিমন্যু গুহ

দেশ আগে না দল আগে গোছের ন্যাকা ন্যাকা বিতর্ককে আমরা বহুকাল হলো পেরিয়ে এসেছি। সে একটা সময় ছিল যখন বামপন্থীদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের আদর্শগত পার্থক্য বোঝাতে এজাতীয় বাক্য ব্যবহৃত হোত। দেশপ্রেম মানে কেবল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ডের প্রতি ভালবাসা; তার চৌহাদ্দির বাইরে থাকা মানুষজনকে ভালোবাসার নামই আন্তর্জাতিকতাবাদ। জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা এই আন্তর্জাতিকতাবাদ অনেক উদার এবং বামপন্থীরা এই উদারতায় বিশ্বাসী। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা, তারপর বাষট্টির ভারত-চীন যুদ্ধের সময় বে-লাগাম হয়ে চীনের সমর্থনে এগিয়ে আসা ও এধরনের নানাবিধ ঘটনায় কমিউনিস্টদের এই 'উদার আন্তর্জাতিকতাবাদে'র তত্ত্ব ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, 'ভৌগোলিক ভূখণ্ডে'র তকমা দিয়ে দেশের বিরোধিতা করে কীভাবে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করতে হয় বামপন্থীরা সেটা স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের মানুষকে বুঝিয়ে আসছেন।

সাতের দশকে একটা উত্তাল সময় ছিল যখন মেধাবী ছাত্র-যুবদের মগজ ধোলাই করতে এধরনের আন্তর্জাতিকতাবাদের খোয়াব দেখানো হোত। সেই সূত্রেই মূলত পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল বামেরা। তারপর স্বরূপ উন্মোচিত হতে ঘাড়ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু এদের রক্তে দেশদ্রোহিতার যে বীজ মিশে গিয়েছে তা এদেশীয় বামপন্থা বা কমিউনিজমের দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত আর পরিশুদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আজকের এই সমস্যাটা নতুনতর। সারা পৃথিবী (অবশ্যই চীন ও পাকিস্তান বাদে) যখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের দিকে এগোচ্ছে, তখন চীন-পাকিস্তানের দালালিই শুধু করছে না কমিউনিস্টরা, সংসদ-হামলাকারী জঙ্গিকেও 'মহাত্মা' বানাতে তাদের আকুলি-বিকুলি দেখলে একটাই কথা বলতে ইচ্ছে করে— ধরণী দ্বিধা হও।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের ঠাঁইনাড়া বলতে কোনোদিন কিছু ছিল না, কেবল 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি' ছাড়া। সেই ঘটি-বাটিও চাঁটি হয়েছে। তবু তাদের মতাদর্শবাহী কিছু যন্তর আজও রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে একজন আবার একদা জাতীয়তাবাদী একটি প্রভাতী দৈনিকের সম্পাদক পদেও সম্প্রতি আসীন হয়েছে। এরাই 'আফজল গুরু জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান যুগ যুগ জিও', 'চীন তোমায় ভুলছি না, ভুলব না' গোছের ধ্বনি তুলছে। আর জনগণ-প্রত্যাখ্যাত কংগ্রেসও এদের দোসর হচ্ছে। কাশ্মীর নিয়ে নেহরুর ভুলের খেসারত ভারত আজও দিচ্ছে। আরও কতদিন এটা দিয়ে যাবে সেটাই চিন্তার। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপাত জাতীয়তাবাদী চরিত্র ছিল।

এর আগেও ইন্দিরা গান্ধীর আমলে,

> সিপিএম-কংগ্রেসের দোষ হলো এরা পাকিস্তান বলতে বোঝে মুসলমানদের। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু বললে বা করলে এদের গায়ে ফোস্কা পড়ে, সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবেই।

রাজীব গান্ধীর আমলে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। আবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনও করেছে। কিন্তু কোনোদিন এভাবে জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে আপোশ করেনি। ভারতের সংবিধান মোতাবেক যাকে ফাঁসির সিদ্ধান্ত নিল দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং যে আদেশ রাতারাতি কার্যকর করার বন্দোবস্ত করল কংগ্রেস পরিচালিত দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার সেই ফাঁসির আসামী আফজল গুরুর পরিবারবর্গকে কোনো খবর না দিয়ে, তারাই কমিউনিস্ট আয়োজিত আফজলের মৃত্যুবার্ষিকী পালন হলো না কেন, এই প্রতিবাদে ভারতের গণতন্ত্রের পীঠস্থানে হামলাকারীকে 'হিরো' বানিয়ে ফেলে তখন তা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বই কী!

আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য উরির ঘটনা। একে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। প্রথমে আফজল গুরুকে 'শহিদ' করে দেওয়া, পরে এক কাশ্মীরি জঙ্গি বুরহানের ক্ষেত্রেও একই জিনিস সংঘটিত করে পাকিস্তানকে উসকে দেওয়ার কাজটা বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল (যার মধ্যে অন্যতম দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম জনতা পার্টি) খুব ভালোভাবে করতে পেরেছিল। ভেবে দেখুন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার যখনই আসে, তখনই পাক-হামলার পরিমাণ এত বেড়ে যায় কেন? ১৯৯৯ সালে কার্গিল হয়েছিল, এবার পাঠানকোট, উরি। অথচ পাকিস্তানের দিকে দু'বারই বন্ধুত্বের হাত, সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ভারত কসুর করেনি। প্রথমবার নওয়াজের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ভারত-পাক মৈত্রীর একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। নরেন্দ্র মোদীও এবার নওয়াজকে জন্মদিনে আলিঙ্গন করেছেন। দু'দেশের বন্ধুত্বের উন্নতিতে তিনিও বহু কর্মসূচি নিয়েছেন।

কিন্তু পরিস্থিতির কোনো বদল হয়নি। প্রশ্ন হলো কেন হয়নি? পাকিস্তানের চরিত্র এঁরা জানতেন না তা নয়। এবং সেই চরিত্র যে কোনোদিন শুধরানোর নয় একথাও তাঁরা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু তবুও চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের সাফল্য এঁরা বিশ্বের কাছে ভারতের বার্তাটা সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ভারত দেখাতে চেয়েছে যে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিপক্ষে তারা নয়। কিন্তু কোনোমতেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানো পাক জঙ্গিদের রেয়াত করা হবে না। পাক-গণতান্ত্রিক কাঠামো বলে যেটা পরিচিত অর্থাৎ সেদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, তাঁর প্রতি অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং নরেন্দ্র মোদী দু'জনেই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যদিও যে দেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানকার জঙ্গি মদতপুষ্ট সেনাবাহিনী ও গুপ্তচর সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হন, তিনি যে ভারতের দু'দুজন বলিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর সম্মান রক্ষায় অপারগ হবেন সেটা জানা কথা। আজ এটা মানতে কোনো বাধা নেই যে বিহারে নির্বাচনের সময় অমিত শাহ যে কথাটি বলেছিলেন অর্থাৎ বিজেপি হারলে পাকিস্তানে বাজি ফাটবে তার স্বপক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন দাউদ ইব্রাহিমের বেয়াই জাভেদ মিঁয়াদাদ। তিনি আবার ঘটনাচক্রে এক নামি ক্রিকেটারও।

কিন্তু পাক-জঙ্গিসুলভ এক বক্তব্যে তিনি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী যতই চেষ্টা করুন ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি করতে, তাঁর অতীত সেই চেষ্টাকে প্রতিহত করবে। কোন অতীত? সেই অতীত যেখানে গোধরায় বিনা অপরাধে করসেবকদের পুড়িয়ে মারা হলে, এক গালে চড় খেয়ে আরেক গাল বাড়িয়ে দেওয়ার মতো, আরও কিছু করসেবককে পোড়াতে উৎসাহিত না করার অতীত? আসলে পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে এ এক কঠিন ঠাঁই। এমনই কঠিন যে ভারতের শাসন ক্ষমতায় বিজেপি এলেই তাদের মাথাখারাপ হওয়ার জোগাড় হয়। নেহরুর ভুলে কাশ্মীরের একাংশের দখল আজও পাকিস্তানের হাতে। তারা আজও এই আশা নিয়ে হয়তো বসে আছে নেহরুর অকালকুষ্মাণ্ড বর্তমান বংশধরেরা তাদের হাতে গোটা কাশ্মীরটাই তুলে দেবে। তাই বিজেপি ক্ষমতায় এলেই তাদের এমন মরিয়া ভাব।

বিজেপি-র দুর্ভাগ্য ভারতের রক্ষণকে আঁটসাট করতে তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় ঠিকই কিন্তু পূর্ব-জমানার ঘূণ ধরা দেওয়ালকে মেরামত করতেই জান কয়লা হওয়ার জোগাড় হয়। কার্গিলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এবার পাঠানকোট, উরিতেও ঠিক তাই হলো। আগের জমানার দুর্বল প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিরা তাদের নিরাপদ আস্তানা গড়ে তুলেছে। আর বর্তমান সরকারের আমলে সম্মুখ সমরে না পেরে, পেছন থেকে হামলা করছে। পাকিস্তানের জঙ্গি কার্যকলাপের একচ্ছত্র মদতদাতা চীন। তার এদেশীয় রাজনৈতিক ভৃত্যদের কী গোঁসা উরির পরিপ্রেক্ষিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরে! পারলে চীন-পাকিস্তানের হয়ে পরমাণু বোমাটা তারাই ভারতের ওপর ফেলে দেয়।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কিছু বলল না বটে, তবে সোশ্যাল মিডিয়া ছয়লাপ হতে থাকল 'যুদ্ধবাজ মোদী', 'দাঙ্গাবাজ মোদী' ক্যাপশনে। সারা দেশের মানুষ যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুঁসতে শুরু করেছেন, তখন সেই 'শান্তির দূতে'দের মুখপত্র এক বাজারি পত্রিকা ফোঁসফোঁস কান্না শুরু করল--- অহো। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনারা কী অত্যাচারটাই না করেছে! ওরা মরবে না তো কারা মরবে! পারলে পুরো কাশ্মীরটা পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয় আর কী!

আর এদের সহযোগী কংগ্রেসের হাল তো কহতব্য নয়। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের আড়াই দিন পরে স্বঘোষিত 'যুবরাজ' দেখা দিলেন। রীতিমতো খোঁচা দিয়ে বললেন— 'গত আড়াই বছরে মোদীজী এই একটিই ভালো কাজ করেছেন'। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ভোল বদলে নিজেরাই বগল চাপড়াতে লাগলো আমরাও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি! একবার নয় তিনবার!' কী হয়েছে না হয়েছে সেটা সেনাবাহিনীর লোকজন, কূটনীতিকরা ভালো বলতে পারবেন, বিশেষ করে এর কৌশলগত ও কারিগরী বিষয়টি। কিন্তু মোটা মাথার বুদ্ধি বলে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক সংঘটিত করতে হয় বিশেষ প্রয়োজনে। এরকম প্রয়োজন কি কং-জমানায় পড়েছিল? যদি পড়ে থাকে তবে সেটা কী একটু খুলে বলবেন কং-নেতৃত্ব? আসলে সিপিএম-কংগ্রেসের দোষ হলো এরা পাকিস্তান বলতে বোঝে মুসলমানদের। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু বললে বা করলে এদের গায়ে ফোস্কা পড়ে, সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবেই। তবে কমিউনিস্টদের জন্য একটি দুঃসংবাদ— এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি খবর এ রাজ্যবাসী দীপাবলী উপলক্ষে চাইনিজ প্রদীপের চেয়ে দেশীয় পণ্যের দিকেই বেশি ঝুঁকছেন। পৈতৃক আয় কমে গেলে কার আর মাথার ঠিক থাকে বলুন!

চিঠিপত্র

তিন তালাক

বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্রের একটি সংবাদে প্রকাশ, দুবাই থেকে জনৈক মুর্দুজা আনসারি তার স্ত্রী কলকাতাবাসী ইরসাত জাহানকে টেলিফোন মারফত তালাক তালাক তালাক বলে বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করে তার ৭ থেকে ১২ বছরের চার সন্তানের ভরণপোষণ এবং শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেছেন। ন্যায় বিচারের আশায় এই ভদ্রমহিলা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকারকে তাদের মতামত জানানোর জন্য নোটিশ জারি করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীর জামা মসজিদের শাহি ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি বলেছেন, 'শরিয়তি আইন কোর্টের এক্তিয়ারের বাইরে'।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শাহি ইমাম সাহেব এবং ভারতের বিদগ্ধ মুসলমান সমাজের নিকট আমার প্রশ্ন— বহু বিবাহ, যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদন, তালাক ইত্যাদি ব্যাপারে শরিয়ত মানবেন আর অন্য ব্যাপারে ভারতের অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সুবিধা নেবেন তা চলতে পারে না। আপনারা পুরো শরিয়ত আইন মেনে নিন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। শরিয়ত মতে মুসলমান চুরি করলে হাত কেটে নিতে হবে। পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড ইত্যাদি করতে পারবে না, কারণ এগুলিতে ফটো বাধ্যতামূলক। ইসলাম ধর্মে ফটো তোলা নিষিদ্ধ। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে টাকা রেখে সুদ নিতে পারবে না, কাফের (মূর্তিপূজক হিন্দু)-দের অধীনে চাকুরি করতে পারবে না। মোবাইল, টেলিফোন, টিভি, ল্যাপট্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ এগুলি ইসলাম বিরোধী। এব্যাপারে ভারতীয় বিদগ্ধ মুসলমানদের মতামত এই পত্রিকা মারফত জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

অস্তিত্বের সংকটে বঙ্গবাসী হিন্দু

বহু বিলুপ্ত প্রাণী-গোষ্ঠীর ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে সনাতন ধর্মী হিন্দু অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে, কেবলমাত্র বিধর্মী জঙ্গি বিশ্বাসঘাতক কিছু মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রশাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে। এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি— (১) ৩৪ বছর বামশাসনের শেষ দুটি দশকে গোপনে সংগঠিত মৌরসি পাট্টাগিরির পরিণাম স্বরূপ বামেদের বর্তমানে প্রায়শ্চিত্ত চলছে, চলবে। তবু বাংলার সচেতন ভোটাররা বামেদের চিরশত্রু কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে ফিরিয়ে আনেনি। রাজনীতির সুলুক সন্ধানী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা ভাল করেই পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কাঙ্ক্ষিত ভিতটির খোঁজ পেয়েছেন। কংগ্রেসও চারদশক ধরে তার পরিণাম হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে।

(২) দুটি দশক বামশাসনের তীব্র নিষ্পেষণ সত্ত্বেও কংগ্রেসকে না ফেরানোর কারণটি হলো— ১৯৭২-৭৭ সাল পর্যন্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর ও মায়া রায়ের রাজনৈতিক দস্যুবৃত্তি এবং 'কংশাল' ছদ্মবেশে জমিদার-জোতদার নিধনযজ্ঞ। তার পরিণামে মায়া রায়ের কষ্টার্জিত আর্থিক ক্ষতির শোকানলে রাজনৈতিক অবসর গ্রহণ এবং কিছুদিন পর তাঁর প্রয়াণ। পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুর পর পর বারবার নির্বাচনে পরাজিত হওয়া। ইন্দিরাজীর অনুকম্পায় রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রদূত হবার খবর আমরা জানি ও দেখেছি।

(৩) একথা অনস্বীকার্য যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর পরিশ্রমী এবং ভালো কূটরাজনৈতিক দক্ষ অভিনেত্রী। অতি সহজে মানুষের মন ভোলাতে পারদর্শী। বামেদের বিরুদ্ধে গদিদখলের বিকল্প কী কী তা মস্তিষ্ক-ভাণ্ডারে জমা করে রেখেছিলেন, সুযোগ এলে কাজে লাগাবেন বলে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম তাঁর সম্মুখে পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মানসিকতা, চলন-বলন-ভাষণ, মিথ্যাচার, উগ্রস্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনোই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উপযুক্ত এবং শোভন নয়। কারণ, স্বাধীনতার পর বাংলার বুকে যা কখনই সম্ভব হয়নি, মমতা ব্যানার্জী তাঁর প্রথম পাঁচ বছরের শাসনকালেই ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। রং-চং-য়ের চাক্‌চিক্যে ভরিয়ে উন্নয়নের নামে আর্থিক অপচয়ে ঘটিয়ে শিল্পে বিনিয়োগের নামে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি বাংলাকে নিয়ে কী খেলা খেলবেন, তা তিনি নিজেও জানেন না! তিনি সংবিধান মানেন না। তার দলের নীচুতলার কর্মীদের গোষ্ঠীকোন্দল তাঁকে না মানার ফসল নয় কি?

(৪) বাম-কংগ্রেস জোট ও তৃণমূলের ব্যবধান মাত্র ত্রিশ লক্ষ ভোট। তাতেই ২১১ আসন? তাও আবার ৩৫ শতাংশ বুথে জোটের পক্ষে এজেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। অর্থ দিয়ে ঘোড়া কেনাবেচা হয় জানি। এবার যুক্ত হয়েছে গ্রামজুড়ে, কথা না মানলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পরিবার শুদ্ধ মেরে ফেলার হুমকি! 'যেন-তেন- প্রকারে বিরোধীশূন্য করতে হবে কেন? মমতাদেবীর 'প্যানিক ডিজিজ' কেন তাড়া করছে সর্বদা? একি গণতন্ত্রের ভালো লক্ষণ, নাকি বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি!

—**প্রফুল্ল কুমার সরকার,**
দেবনগর, জলপাইগুড়ি।

মহাভারতের পুনরাবৃত্তি

'জাতোহয়ং জগতাংবাধীঃ কৃষ্ণো পরমদুর্জয়ঃ' (জগতের ভয়ানক শত্রু দুর্জয় কৃষ্ণ অবতীর্ণ, আসুন আমরা একত্রে তাঁকে প্রতিহত করি), কথাটি মহাভারতের সময়ে মগধের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা জরাসন্ধের যুদ্ধার্থে আহ্বান। জরাসন্ধ ভারতব্যাপী সামরিক জোটের লক্ষ্যে একটা মহাসম্মেলনের আহ্বান জানান যা বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা কন্‌ফারেন্সের মতো। সম্মিলিত ওই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আঠারোবার সংঘর্ষ

প্রতিহত করেও শ্রীকৃষ্ণ প্রজাদের মঙ্গলার্থে মথুরা থেকে পশ্চিম ভারতের দ্বারকায় রাজ্য স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময়ে ওই অশুভ শক্তি সমূলে বিধ্বস্ত হয় শ্রীকৃষ্ণের কৌশলেই।

এখন, ঐতিহাসিক ওই ঘটনার অবতারণার কারণ হলো বর্তমান ভারতের একদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং অপরদিকে বিভিন্ন রঙ ও মতের একটা গোঁজামিল দেওয়া জগাখিচুড়ি রাজনৈতিক জোট। এই অ-বিজেপি পক্ষটি যে-কোনো প্রকারে বিজেপি সরকার এবং তার জাতীয়তাবাদী তত্ত্বকেই উৎখাতে উদ্‌গ্রীব এবং সক্রিয়। এই যুদ্ধে প্রথম পক্ষের সুদর্শন চক্র হলো জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেম। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ জোটের অস্ত্র তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে তার সর্বৈব বিরোধিতা। তাদের মূলধন সংখ্যাগুরু হিন্দুর আত্মঘাতী রাজনীতিপ্রিয়তা। এদের লোকদেখানো নিরপেক্ষতার পিছনে কাজ করছে নির্লজ্জ ক্ষমতালোভ ও দলীয় স্বার্থ যা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এদের অন্যান্য অস্ত্র হলো সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে দুর্নিবার মুসলমান তোষণ ও পিছড়ে বর্গের নামে জাতীয় সম্পদ অপহরণ বামপন্থী নীতিতে। ভারতে গত সাতদশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রমাবনতির চিত্রই তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। সম্ভাব্য নড়বড়ে 'একজোট' দ্বিতীয় পক্ষের হোতা ও মূল গায়েন হলেন বরাবরের ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চের বিদূষক ছোট্ট এক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যিনি এবার কুইকজোট মার্কা এক সেনাপতিত্বের দাবিদার। বেশ কয়েকবার পরীক্ষিত এবং জনগণের দ্বারা ডিম্বাবস্থাতেই বাদাড়ে পরিত্যক্ত বিরোধী পক্ষের জোটের সামনের সারিতে তিনি। কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে মমতার সহায় বলতে কাঁকড়াবৃত্তির খেয়োখেয়িতে ব্যস্ত কিছু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যারা নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। আধুনিক ভারতের জরাসন্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণতির কথাটা ভাববেন কি? তাঁর নিজের দলও অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ।

—**অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,**
তারকেশ্বর, হুগলী।

সনাতন ধর্ম ধ্বংসের প্রক্রিয়া

আমরা অনেকেই জানি না পৃথিবীর প্রাচীন প্রকৃতি ও মূর্তিপূজার ধর্মসংস্কৃতি কীভাবে বিনাশ হলো। ইউরোপের মানুষেরা ছিল মূর্তি পূজারি আমাদের দেশের হিন্দুদেরই মতো। সম্রাট কনসস্টেনটাই তৃতীয় শতাব্দীতে ইউরোপ দখল করার পরে মন্দিরে মন্দিরে আর নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে দিলেন না। ফলে ধীরে ধীরে মূর্তিপূজা বন্ধ হলো এবং তিনশো বছরের মধ্যে ইউরোপে আর মূর্তিপূজক থাকল না। চার্চে প্রার্থনা চলল। বাংলাদেশে মন্দিরের পুরোহিতদের হত্যা চলছে। বাংলাদেশেও পূজার পুরোহিত আর পাওয়া যাবে না। পূজা বন্ধ হবে। ইউরোপ যেমন খ্রিস্টান-ইউরোপে পরিণত হলো, বাংলাদেশও শীঘ্র একই প্রক্রিয়ায় মুসলমান বাংলাদেশে পরিণত হবে। এটা ভারতবাসী জানে না যে তারা ঐক্যবদ্ধ না হলে তাদের দশাও ওইরকম হবে।

—**ড. কৃষ্ণকান্ত দাস,**
দমদম।

কাবা মসজিদ

অনিল চন্দ্র দেবশর্মা 'মক্কাঃ কিছু কথা' প্রসঙ্গে বলেছেন বর্তমান কাবায় আরবরা যে পুজো করেন তা আসলে 'মক্কেশ্বর শিবলিঙ্গ'। হজরত মহম্মদ দৈববাণী অনুযায়ী সেই শিবলিঙ্গকে ধ্বংস না করে পাথর দিয়ে ঢেকে মুসলমানদের ওখানে হজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (চিঠিপত্র, ২৩.৭.২০১২)।

প্রাক্‌-ইসলাম আরবে পৌত্তলিকতার প্রচলন ছিল এবং হজক্রিয়ার কিছু রীতিনীতি যা আজও মেনে চলা হচ্ছে তা হিন্দুরীতির অনুরূপ। অনেকের মতে, মক্কার কাবা প্রকৃতপক্ষে মক্কেশ্বর শিবের মন্দির ছিল; সেখানে এখন যে পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তর 'হাজার আসোয়াদ' বর্তমান, সেটি পূর্বেকার শিবলিঙ্গেরই ভগ্নাংশ বিশেষ।

সীতারাম গোয়েল Hindu Temples : What Happened to Them'–Vol. II (1993) গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ('was the Kaba a Siva Temple?') বলেছেন, হিন্দুদের কাছে কাবা একটি পবিত্র তীর্থ ('a hollowed place of pilgrimage') ছিল; কিন্তু কাবা একটি শিবমন্দির ছিল, তা বলা যায় না। কারণ, প্রাক-ইসলামি আরবরা হিন্দু ছিল তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

Sir williem Muir-এর The Life of Mohomet গ্রন্থে 'হাজার আসোয়াদ'-এর ফটো দেওয়া আছে। Muir-এর বিবরণ অনুযায়ী, ৬ ইঞ্চি উঁচু ও ৮ ইঞ্চি চওড়া অর্ধবৃত্তাকার লালচে-কালো অমসৃণ এবড়ো খেবড়ো ওই প্রস্তরখণ্ডটি একটি আগ্নেয় শিলা।

মক্কা দখল করার পর হজরত মহম্মদ কাবার ভিতরকার দেবদেবীর সমস্ত বিগ্রহ ধ্বংস করেন। কিন্তু হিজরির ষষ্ঠ বছরে (মার্চ, ৬২৮) কোরেশদের সঙ্গে সম্পাদিত বিখ্যাত 'হুদাইবিয়ার চুক্তি' অনুসারে ('দৈববাণী' অনুযায়ী নয়) তাদের প্রধান দেবতা কালো পাথর বা আসোয়াদকে সসম্মানে স্বস্থানে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন (দ্র. ইসলামি ধর্মতত্ত্ব, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী—পৃ. ২০৫)। উল্লেখ্য, নবীর ওই কার্যটি খলিফা ওমরের (খ্রি. ৬৩৪-৪৪) পছন্দ ছিল না। কয়েক বছর পর ওই পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরটি চুম্বন করার সময় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল— ''I Know that you are a black stone which can with left hurt. I would not have kissed you, had I not witnessed the prophet of Alleh kissing you" (দ্র. হিন্দু টেম্পলস্‌— সীতারাম গোয়েল পৃ. ৩৫৬)। উল্লেখ্য, পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরটি কাবাই মসজিদের বাইরের পূর্বকোণে স্থাপিত। মক্কা দখলের পর হজরত মহম্মদ কাবা মসজিদে গিয়ে লাঠির সাহায্যে পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরকে চুম্বন করে সাতবার কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করেন। তারপর তালা ঝুলিয়ে ভিতরে ঢুকে অভ্যন্তরস্থ দেবদেবীর বিগ্রহগুলি ধ্বংস করেছিলেন।

অনিলবাবু তাঁর পত্রে 'তাজমহল হিন্দুমন্দির' গ্রন্থের লেখকের নাম 'পি. এন. হক' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা 'হক' না হয়ে 'ওক' হবে।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

দেবী জগদ্ধাত্রী

দেবপ্রসাদ মজুমদার

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তির এক প্রসিদ্ধ মূর্ত্যন্তর হলো জগদ্ধাত্রী মূর্তি। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান মূর্তিতে বলা হয়েছে— 'দেবী সিংহপৃষ্ঠে আসীনা নানালঙ্কার ভূষিতা, চতুর্ভুজা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, বাম দুই হাতে শঙ্খ ও শার্ঙ্গ বা ধনু ও ডানদিকের দুই হাতে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারণ করে আছেন; রক্তবস্ত্র পরিহিতা, প্রভাত সূর্যসদৃশ, রক্তবর্ণা, নারদ প্রমুখ মুনি দ্বারা পূজিতা, নাভিপদ্মের লালরূপ মৃণাল যাঁর ত্রিবলীবলয়যুক্ত হয়ে শোভা পায়, তিনি রত্নদীপময় দ্বীপে সিংহ আসনে প্রস্ফুটিত পদ্মে আসীনা, সেই শিব-গৃহিণীকে ধ্যান করি।' দেবীর পায়ের কাছে এক হাতির মাথা দেওয়া থাকে। ওইটি করীন্দ্রাসুরের মাথা।

কিংবদন্তী অনুসারে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেছিলেন। শারদীয়া দুর্গাপূজার শেষে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে নৌকায় কৃষ্ণনগর ফিরছিলেন, তখন দুর্গাপূজার কাল শেষ, ওই বিষয়ে ধার্মিক রাজা মনোকষ্টে ছিলেন। নৌকা থেকেই ঢাকের আওয়াজ শুনে তিনি জানতে পারেন যে ওই দিন বিজয়া দশমী ভাষাণের দিন। সেই দিন রাত্রিতে দেবী দুর্গা রাজাকে জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা দিয়ে একমাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেন, বিজয়া দশমীর দিন তিনি চন্দননগরে পৌঁছন ও মনোদুঃখে পুরোহিত পণ্ডিতদের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা মন্তব্য করেন যে কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে তিনি দুর্গার প্রতিরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেবী পূজা করতে পারেন। এক দিনেও ওই পূজা করা যায় আবার দুর্গাপূজার মতো ষষ্ঠী থেকে দশমী পূজার বিধি আছে। তদনুসারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে দেবীর পূজা করেন।

জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাচীনতা নিয়ে নানান বিতর্ক আছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল— ১৭১০-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ। সে অর্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা হয় বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু ওই তথ্য ঠিক নয়। কারণ রঘুনন্দনেরও দুইশো বছর পূর্বে শূলপাণি তাঁর 'কাল বিবেক' গ্রন্থে কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মনে করেন যে, জগদ্ধাত্রী পূজা শূলপাণি ও পূর্ববর্তী, কারণ কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীই জগদ্ধাত্রী। কাত্যায়নী তন্ত্রেও উমা হৈমবতীই যে জগদ্ধাত্রী তার উল্লেখ আছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতেও জগদ্ধাত্রী দেবীর উল্লেখ ও ব্রহ্মা যে জগদ্ধাত্রীর স্তব করেছিলেন তার উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণ ও তন্ত্রের কাহিনি অনুসারে এক সময় অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র এই চারজন ঠিক করেন যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁরাই জগতের ঈশ্বর। এই অহংকারের কথা শুনে আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা কোটি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়ী হয়ে এঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। এরা বিষয়টা বুঝতে না পেরে প্রথমে পবনদেবকে দেবীর কাছে পাঠান। একটি তৃণখণ্ড সামনে রেখে পবনদেবকে ওই জ্যোতির্ময়ী দেবী তা তুলতে বলেন, কিন্তু শত চেষ্টাতে পবনদেব ওই তৃণখণ্ড তুলতে পারেন না। এর পর অগ্নি এলে পর ওই দেবী তাঁকে ওই তৃণখণ্ডটিকে পুড়িয়ে ফেলতে বলেন। অগ্নিদেব চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এরপর অপর দুজনও ব্যর্থ হয়ে ওই জ্যোতির্ময়ী দেবীর আরাধনায় রত হন। ওই জ্যোতির্ময়ী দেবীই জগদ্ধাত্রী। মায়াতন্ত্রে ও তন্ত্রসারে দুর্গা দেবী প্রসঙ্গে জগদ্ধাত্রী দেবীর উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে দুর্গারই ভিন্ন নাম জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গা পূজার সংক্ষিপ্ত রূপ বলে পণ্ডিতেরা মনে করে থাকেন। দেবী মূর্তিতে দুর্গাদেবীর দশ হাতের পরিবর্তে চার হাত, দেবী একাকী। কার্তিক গণেশ নেই। তবে লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থানে জয়া ও বিজয়ার অবস্থান। পূজা পদ্ধতি মন্ত্র প্রায় একই, তবে দুর্গা পূজার ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ, নবপত্রিকার স্থাপন ও বোধন এখানে হয় না। যাইহোক, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল থেকেই জগদ্ধাত্রী পূজা জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুসরণ করে তাঁর বন্ধু চন্দননগরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা করতেন বলে প্রসিদ্ধ। সেই হিসাবে অদ্যাবধি কৃষ্ণনগরে ও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার সমারোহ, খ্যাতি ও ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর-মীরহাট গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার কোগ্রামে দুশো আড়াইশো বছরের প্রাচীন জগদ্ধাত্রী সমারোহে পূজিতা হয়ে থাকেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জগদ্ধাত্রী, দুর্গা ও কালী মূর্তিকে স্বদেশ জননীর তিনটি অবস্থান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় জগদ্ধাত্রী প্রাচীন ভারতবর্ষের মূর্তি, দুর্গা শত্রুদলনকারিণী ভবিষ্যতের ভারতমাতার মূর্তি, আর কালীমূর্তি ইংরেজ শাসনে সর্বরিক্তা ভারতমাতা।

ঋণ স্বীকার :

১। পৌরাণিকা— অমল মুখোপাধ্যায়। ২। হিন্দুদেবদেবী, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ— হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। ৩। অন্যান্য পত্র-পত্রিকা।

জগদ্ধাত্রী যেখানে ‘বুড়ো মা’

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের একদা পরিচিতি ছিল ‘কাঁসারি পাড়া’ হিসেবে। কেননা এলাকাটি এক সময় কাঁসারি বা কংসবণিক সম্প্রদায় অধ্যুষিত ছিল। কংসবণিক সম্প্রদায় পরিচালিত সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো, যা ‘বুড়ো মা’ নামে এলাকায় সমধিক পরিচিত, আনুমানিক তিনশো বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই পুজোই সম্ভবত কলকাতার প্রাচীনতম জগদ্ধাত্রী পুজো। এর থেকে প্রাচীন পুজো কলকাতায় আর আছে বলে জানা যায় না। ‘বুড়ো মা’র পুজো ঠিক কবে শুরু হয়েছে, তা আজও অজানা। এলাকার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি এবং তারক প্রামাণিকের (যাঁর নামাঙ্কিত রাস্তা ‘তারক প্রামাণিক রোড’) বংশধর শিবেন্দ্র কুমার প্রামাণিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁরাও আশৈশব পিতৃ-পিতামহের কাছে ‘বুড়ো মা’র পূজানুষ্ঠানের কথা শুনে আসছেন। ‘বুড়ো মা’ নামের মধ্যেই অবশ্য সেই প্রাচীনত্ব নিহিত রয়েছে।

‘বুড়ো মা’-র পুজো অনুষ্ঠিত হয় সিমুলিয়া পাড়ায় ৩৬ নম্বর সরকার লেনে নবনির্মিত মন্দিরে। শুরু থেকে একই স্থানে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আড়াইশো থেকে তিনশো বছর আগে, গাছপালা পুকুর সমেত এক বিশাল জমিতে, গাছের তলায়, তালপাতার ছাউনির নীচে ‘বুড়ো মা’ পূজিত হতেন। পরবর্তীকালে প্রামাণিক পরিবারের উত্তরসূরি প্রমথনাথ প্রামাণিক পুকুর বুজিয়ে ওই জায়গায় ‘দালান মন্দির’ তৈরি করে দেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরনো ‘দালান মন্দির’ আমূল সংস্কার করে দ্বিতল কক্ষ এবং চূড়া বিশিষ্ট সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে।

প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে ‘বুড়ো মা’-র পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজো একই দিনে তিন প্রহরে বিভক্ত। সকালে সাত্ত্বিকা, মধ্যাহ্নে রাজসী ও সন্ধ্যায় তামসী পুজো। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, ‘বুড়ো মা’ অত্যন্ত জাগ্রতা। অনেকেরই মানত করে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। পুজোর দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ‘বুড়ো মা’-র পুজোপ্রাঙ্গণ অগণিত দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ থাকে। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন ‘বুড়ো মা’-কে দর্শন করতে।

ডাকের সাজে সজ্জিতা সালঙ্কারা দেবীমূর্তি। দেবীর বাহন শ্বেত বর্ণের সিংহ। স্বর্ণ এবং রৌপ্যনির্মিত অধিকাংশ অলঙ্কার ভক্তদের দান করা। অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় প্রতি বছরই একটি-দুটি করে অলঙ্কার সংযোজিত হয়। পরের দিন দশমী পুজোর পর সন্ধ্যায় বিসর্জন শোভাযাত্রায় পল্লীর আবালবৃদ্ধবণিতার অংশগ্রহণ অভূতপূর্ব।

যেহেতু ‘বুড়ো মা’-র পুজো মূলত কংসবণিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য ওই সম্প্রদায় ব্যতীত কারও কাছ থেকে চাঁদা সংগৃহীত হয় না। তবে পুজোয় অংশগ্রহণে কারও বাধা নেই। চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতিও অভিনব। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করা হয় না। প্রত্যেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুজোমণ্ডপে এসে চাঁদা দিয়ে যান। অন্য সম্প্রদায়ের কেউ চাঁদা দিতে আগ্রহী হলে, তাকে প্রণামী বাক্সে দিতে হবে।

বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকলেও ‘বুড়ো মা’-র পুজো আজও অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং শুদ্ধাচারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সাঁচী স্তূপ

সৌমেন নিয়োগী

সমগ্র বিশ্বে মানব সভ্যতার কৃষ্টির অগ্রগতির ছাপ পড়ে থাকে, তার শিল্পচেতনা ও তার স্থাপত্য শৈলীর মাধ্যমে, যা শত শত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনে, বিভিন্ন সময়ের শিল্প ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার এক সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য হিসাবে। আজও কালের নৈপুণ্যের উৎকর্ষতাকে উন্মোচিত করে চলেছে, এমনই একটি স্থানের নাম 'সাঁচী'। প্রসিদ্ধ এই বৌদ্ধ স্তূপ ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত এক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বিস্মৃতির অতল থেকে জেনারেল টেলর সমগ্র বিশ্বের কাছে সাঁচী স্তূপকে তুলে ধরেন যা বর্তমানে ভারতের মধ্যপ্রদেশের রায়সানা জেলায় অবস্থিত। সাঁচী প্রাচীনকালে কাজানয়া, কাকানভ, কাঞ্চনদোবেতা এবং বোতা শ্রীপর্বত নামে জনশ্রুত ছিল, যা মৌর্য সম্রাট অশোকের জীবনের সঙ্গে ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের এক প্রধান পীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তী সুঙ্গ, সাতবাহন, কুষাণ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রায় ১২০০ বছরের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সাঁচী এক সুবিশাল ঐতিহাসিক স্থাপত্যের আধার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান বিদিশা যা অতীতের বেসনগর থেকে আনুমানিক ৯ কিমি পথ দূরে টিলার উপরে স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ইত্যাদির সমাহারে সমৃদ্ধ এক সুপ্রাচীন কৃষ্টির অনবদ্য স্থান। ২৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ফলে স্থাপিত হয় বহু স্তূপ যার মধ্যে সাঁচী স্তূপ অন্যতম। সেকালে বৌদ্ধ ধর্মের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সকালে ভিক্ষা সংগ্রহের পর একান্তে নিরিবিলি স্থানে তাঁদের ধর্মীয় আচার, উপাসনা ইত্যাদি করতেন। ফলত বর্ধিষ্ণু জনপদের উপকণ্ঠে অথচ জনকোলাহল থেকে দূরে বেতোয়া ও বেস নদীর সন্নিকটে পাহাড়ি উচ্চটিলার উপরই গড়ে তোলেন ভারতের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ, যা সম্পূর্ণ ভাবে নিখুঁত ও বিরল। এখানে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে শুরু করে বারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ কলা ও স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং ক্ষয়ের চিত্র বর্ণনা করে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম শতকে চীনা পর্যটক ইউয়েন সাঙের বৌদ্ধ সৌধগুলির উপর গভীর অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীলঙ্কায় রচিত 'মহাবংশ' ও 'দ্বীপবংশ' রচনা থেকে সাঁচী স্তূপ সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থে তাই সাঁচীকে ভারতীয় শিল্পকলার আদি মূল ও ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মৌর্য সম্রাট পাহাড়ি টিলার উপর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম অর্ধবৃত্তাকার ডোমের আকৃতির স্তূপটি নির্মাণ করেন যাকে The Great Stupa বলা হয়। ইষ্টক ও মৃত্তিকার মণ্ড ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বা অণ্ড অর্থাৎ বিশ্ব অণ্ডকে (World Egg) আবাহন বোঝায়। মৌর্যযুগে স্থাপিত এই বৌদ্ধ স্তূপকে কেন্দ্রস্থ করেই বৃহত্তর বৌদ্ধ সঙ্ঘ আগামী দিনে গড়ে ওঠে যার ফলে সুঙ্গ আমলে স্তূপটির আয়তনের বৃদ্ধি ও পাথর দিয়ে পরিবৃত করা এবং পাথরের কারুকার্যের রেলিং দ্বারা যুক্ত ছোট ছোট শিল্প শ্রেণীর যুক্তিকরণ, সিঁড়ির স্থাপন এবং 'হারমিকা' প্রতিস্থাপন এবং এই সবগুলিই নিকটবর্তী অঞ্চলের বেলে পাথরের দ্বারা নির্মিত। সুঙ্গ রাজবংশের অন্যতম নৃপতি 'অগ্নিমিত্র' সাঁচীর এই স্তূপের পুনঃ সংযোজন ও নির্মাণ করান, যার ফলে বর্তমানে ৩৬.৬ মি. ব্যাস ও ১৬.৫ মি. উচ্চতা বিশিষ্ট স্তূপটি, সেই সুঙ্গ আমল থেকেই অপরিবর্তিত রয়েছে। সুঙ্গ আমলের সংযোজন হলো ছত্র বহন, যার ফলে স্তূপের শিখরে হারমিকা নির্মাণ, তিনটি বৃত্তাকার চাকতি বা ছত্র বেলী যা বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্নের প্রতীক— (১) ভগবান বুদ্ধ (২) ধর্ম (৩) সঙ্ঘ।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা স্তূপটিকে কেন্দ্র করে চারটি তোরণ নির্মাণ করেন। এই তোরণগুলির গাত্রে সম্রাট অশোক, ভগবান বুদ্ধ হিনজান বৌদ্ধধর্ম অনুসারে চিহ্নিত, জাতকের বিভিন্ন গল্প, শলভঞ্জিকা-সহ বিভিন্ন ভাস্কর্যের এক সূক্ষ্ম নির্মাণ শৈলীতে খোদিত। এছাড়াও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তূপটি স্থাপন হয় সাতবাহন আমলে যার মধ্যে তৃতীয় স্তূপটি খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ ভগবান বুদ্ধের খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিষ্য সারীপুত্র ও মোধগালয়ণের দেহাবশেষ এই স্তূপটির থেকেই প্রত্নবিদ Alexander Cunningham উদ্ধার করেন। সাঁচী স্তূপে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তযুগে তোরণের দিকে মুখ করে মথুরা শৈলীতে নির্মিত চারটি বুদ্ধ মূর্তি স্থাপিত হয় এবং এই অঞ্চলে গুপ্তযুগের মন্দিরও নির্মাণ করা হয়, যা প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্য শৈলীর মতনই দেখতে এক অনবদ্য শিল্প স্থাপত্য। সাঁচীর স্তূপ সংলগ্ন ঐতিহাসিক স্থানটি শুধু কেবলমাত্র সাধারণ পর্যটকদের নিছক ভ্রমণের জায়গা নয়। বরং এই স্থানটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজবংশের বিশেষত মৌর্য, সুঙ্গ, সাতবাহন ও গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান শিল্প চেতনা কীভাবে পূর্ণতা লাভ করেছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ। ■

নবাঙ্কুর

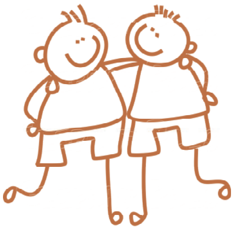

বন্ধু বলে ডাকো যাকে

খবরটা কাগজে বেরিয়েছে। খেলতে গিয়ে নিখোঁজ ছাত্র। ছবিও দিয়েছে। সকালে মা খবরটা প্রথম দেখার পর ঋতমকে ডেকে দেখালো— দেখ দেখ, পলাশের হারিয়ে যাওয়ার খবরটা কাগজে বেরিয়েছ। ঋতম কাগজটা হতে নিয়ে খবরটা প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ল। পলাশ যেদিন হারিয়ে যায় সেদিন ওরা দুজন একসঙ্গে ফুটবল খেলতে বেরিয়েছিল। খেলতে গিয়েছিল মিউনিসিপালিটির মাঠে। পলাশ দুটো গোল দিয়েছিল সেদিন। খেলা শেষে ফেরার সময় রাস্তায় ওর মনে পড়লো বাজারের ব্যাগটা মাঠেই ফেলে এসেছে। ওর মা বেরোনোর সময় বলেছিল ফেরার সময় রমেন কাকুর দোকান থেকে যেন মুদি বাজারটা নিয়ে আসে। ঋতমকে মাঝ রাস্তায় দাঁড়াতে বলে পলাশ আবার ছুটলো মাঠের দিকে। কিন্তু অনেকটা সময় পার হয়ে গেলেও পলাশের ফেরার নাম নেই। এত সময় তো লাগার কথা নয়! ঋতম আর একটু অপেক্ষা করলো। তারপরও যখন ফিরলো না তখন একটু রাগও হলো, পলাশ ওকে দাঁড়াতে বলে এভাবে অন্য রাস্তায় পালিয়ে গেল। বোকা বানালো ওকে! রাস্তায় আর না দাঁড়িয়ে ঋতম বাড়ি ফিরে এসেছিল। কিন্তু পলাশ সেদিন বাড়ি ফেরেনি। কাকিমা রাতে পলাশকে খুঁজতে এলো ঋতমের বাড়ি। ঋতম বিকেলের কথা সব বলল। কাকিমা কেঁদে ফেলেছিল। তখনো কেউ ভাবেনি পলাশ সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছে।

পরের দিন এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি হলো। আত্মীয় স্বজনের বাড়ি। কিন্তু পলাশকে পাওয়া গেল না। বিকেলে থানায় ডায়েরি করা হলো। পুলিশ এলো। ঋতম পুলিশকে সেদিনের সব ঘটনা বলল।

ঋতম বুঝতে পারছে না পলাশের কী হলো। ও কোথায় চলে গেল। কেউ কি ওকে তুলে নিয়ে গেছে? ঋতম আর পলাশ দুজনের খুব বন্ধুত্ব। একসঙ্গে স্কুলে যায়, একসঙ্গে খেলতে যায়। লোকে বলে মানিকজোড়। এখন পলাশ নেই ঋতমের তাই খুব খারাপ লাগে। ভাবে পলাশ কী আর কোনোদিন ফিরবে না। আবার কখনো মনে হয়— না না ও নিশ্চয় কোথাও আছে, কোনোদিন বিকেলে হয়তো হাজির হয়ে বলবে চল খেলতে যাই।

ঋতম এখন একা একা স্কুলে যায়। যেতে যেতে পলাশের কথা মনে পড়ে। স্কুল যাওয়ার সময় ওরা কত কী করত। প্রামাণিক বাড়ির পোষা বানরটাকে ভেংচি কাটত। পলাশ একটু বিচ্ছু মতো, কারো বাড়ির কলিং বেল টিপে এক দৌড়ে পালিয়ে যেত। দুজনে কত মজা হোত। পলাশ ভালো ফুটবল খেলে। পলাশ নেই জন্য এখন কদিন ধরে ঋতমের আর মাঠে যেতে ভালো লাগে না। বিকেলবেলাটা শুধু টিভি দেখে।

আজকে খবরের কাগজে পলাশের ছবি দেখে ঋতম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বলল— মা পলাশ কি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছে? মা বলল— না না ও কোথায় হারিয়ে যাবে। একদিন দেখবি ঠিক চলে আসবে। তখন তোরা আবার একসঙ্গে খেলতে যাবি।

ছুটির দিন বলে দুপুরে খেয়েদেয়ে ঋতম একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় পড়তে বসলো। মা পাশের ঘরে মেশিনে জামা সেলাই করছে। তখনই রাস্তা থেকে ডাক এলো—ঋতম, ঋতম চল মাঠে যাবি।

আরে এতো পলাশের গলা! ঋতম ধরফড় করে উঠে চিৎকার করে বলল— দাঁড়া দাঁড়া যাচ্ছি।

পাশের ঘর থেকে মা ছুটে এলো, বলল— কি হলো তোর? কাকে দাঁড়াতে বলছিস?

ঋতম বলল— মা পলাশ এসেছে আমি খেলতে যাচ্ছি।

মা অবাক হয়ে বলল— কোথায় ঋতম? তুই তো ঘুমোচ্ছিলি।

এতক্ষণে পলাশের হুঁশ ফিরল। এখন দুপুর বা বিকেল নয় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বিছানায় বই রাখা আছে। পড়তে পড়তে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঋতম স্বপ্ন দেখছিল। সেটা বুঝতে পেরে সে নিজে নিজে বলল— তাহলে পলাশ যে আমায় ডাকলো?

মা ঋতমকে জড়িয়ে ধরে বলল— পলাশ এলে আমিই তোকে ডেকে দেবো।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

সিকিম

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য সিকিম। অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রও। দেশের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর সিকিম ভারতে অধীনে একটি সংরক্ষিত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তারপর ১৯৭৫ সালে ভারতের ২২তম রাজ্য হিসেবে সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। প্রধান ভাষা নেপালি। সিকিমের মোট আয়তন ৭,০৯৬ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ৬০৭,৬৪৪ জন।

এসো সংস্কৃত শিখি

तथापि.........।

তবুও ....।

आवश्यकं न आसीत्।

দরকার ছিল না।

तिष्ठतु भोः।

একটু থামুন।

स्मरति खलु?

মনে পড়ছে কি?

तथा किमपि नास्ति।

ও এম কিছু নয়।

ভালো কথা

উদার মন

আমি এই ঘটনা জেঠুর কাছে শুনেছি। একটি গরিব ছেলে রেল স্টেশনে থাকতো। তার ছেঁড়া জামাকাপড়, ছেঁড়া জুতো। একদিন সে দেখল একটি সুন্দর ছেলে স্টেশনে তার বাবা-মার সঙ্গে বসে আছে। তার পায়ে সুন্দর জুতো। ছেলেটি রুমাল দিয়ে বারবার সেই জুতো মুছছিল যাতে ধুলো না লাগে। এক সময় ট্রেন ছাড়ল, ট্রেনে উঠতে গিয়ে সুন্দর ছেলেটির একটি জুতো নীচে পড়ে গেল। ট্রেন তো এগিয়ে চলেছে। স্টেশনের ছেলেটি সেই জুতোটি নিয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু সে জুতোটা আর দিতে পারলো না। দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে এটি দেখে সুন্দর ছেলেটি তার কাছে থাকা জুতোটিও ফেলে দিল। কারণ একটি জুতো পায়ে দেওয়া যায় না। স্টেশনের ছেলেটিও তার হাতের সেই এক পাটি জুতো ফেলে দিয়ে ফিরে এল।

তমাল দত্তরায়, কলকাতা-৭৩

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

পুজোর পরে

রক্তিম দাস, নবম শ্রেণী

মা এলো মা গেল
পুজো হলো শেষ
ঢাকের বাদ্যি মিলিয়ে গেছে
কাটেনি তার রেশ।
এর পরেতে ঘরে ঘরে
হয় লক্ষ্মী পূজা

কালী পুজোর পরেই আবার
ভাইফোঁটাতে মজা।
নতুন নতুন জামাকাপড়
রকমারি খাওয়া
ভুড়িভোজ আর আদর যত্ন—
তারপরেই সব হাওয়া।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ -
৭০৫৯৫৯১৯৫৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

কন্যাভ্রূণ হত্যা

রুণা চৌধুরী (রায়)

বর্তমানে হাইটেকনোলজির যুগে নারী পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যতই অন্তরীক্ষে প্রদক্ষিণ করুক; প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করুক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারিণী হোক, তবুও নারীর অবমাননা, অসম্মান, কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারী ধর্ষণ ক্রমাগত যেন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। কোথাও গাছের ডালে ঝুলন্ত মহিলার মৃতদেহ, কোথাও ডোবা, নালায় নির্যাতিতার লাশ, কোথাও নদী-খালে ভেসে চলেছে সদ্যোজাত কন্যার মৃতদেহ। সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা দৃষ্টান্তমূলক এবং 'কন্যাভ্রূণ হত্যার' মতো চরম অপরাধমূলক ঘটনা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। শিক্ষিতা, সুন্দরী স্কুলশিক্ষিকা যুবতীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয় এক অভিজাত বনেদি পরিবারের একমাত্র ধনীর দুলালের সঙ্গে। স্কুলশিক্ষিকা বৈশালী বিয়ের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় সে স্কুলের চাকরিটা ছাড়বে না, এ বিষয়ে শ্বশুরবাড়ির আপত্তি না থাকলেও সন্তানসম্ভবা বৈশালীকে তারা চাপ দেয় জেন্ডার টেস্ট করাবার জন্য। জোর করে তাকে গাড়িতে তুলে নার্সিং হোমে নিয়ে হাজির হয় তার স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি।

গাইনাকলোজিস্ট লেডি ডাক্তার এক নার্সের সাহায্যে বৈশালীকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে ও. টি. রুমে বেডে শুইয়ে দেয় আল্ট্রা-সোনোগ্রাফির জন্যে। ওকে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে বলে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে যায়, সেই অবসরে বৈশালী বেড থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই শিহরিত হয়ে ওঠে। জানালার ঠিক নীচেই এক ডাস্টবিনের সামনে ওই লেডি ডাক্তার এক নার্সকে নির্দেশ দিচ্ছে কিছু আবর্জনা ফেলার জন্য। নার্সটি একটি বড় প্লাসটিকের ব্যাগ উপুড় করতেই কিছু কালো প্লাস্টিকে মোড়া আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চারপাঁচটা নাদুস নুদুস কুকুর ওই আবর্জনাগুলো চেটেপুটে খেতে থাকে। কিছু হাড়গোড়, মাংসের টুকরো কুকুরের পাল মনের সুখে খেয়ে সাফ করতে থাকে। ওই ভয়ানক দৃশ্য দেখে বৈশালীর বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। বাইরে বেরিয়ে এসে অপেক্ষারত শ্বশুর-শাশুড়িকে কাকুতি মিনতি করে ওই দৃশ্যের বর্ণনা করে অনুরোধ করে এ অন্যায় না করতে। কিন্তু ডাক্তারের কঠোর নির্দেশে ওকে অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অজ্ঞান করে সব

টেস্ট করা হয় এবং পরেরদিন রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে কথা জানানো হয়। বৈশালী তার কলেজ বান্ধবী সমাজ সেবিকা, মহিলা কমিশনের এক্সিকিউটিভ মেম্বার, তিনটি এন জি ওর কর্ণধার সঞ্জিতাকে সব খুলে বলতেই সঞ্জিতা তাকে আশ্বস্ত করে এবং পরদিনই পুলিশের তত্ত্বাবধানে নার্সিং হোমটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং ডাক্তারের হাতে হ্যান্ডক্যাপ পরিয়ে ভ্যানে তোলা হয়। কোর্টে কেস ওঠে, ভুক্তভোগী বহু মানুষ এর সাক্ষী দেয় এবং বিচারে বৈশালীর স্বামী, ওর মা, বাবার বধূ নির্যাতন ও কন্যাভ্রূণ হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ওই ডাক্তার এই জঘন্য অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকার জন্য এবং এই নির্মম কাজ সমাজের বুকে নির্বিবাদে চালাবার জন্য তার দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ওই নার্সটিরও কুকর্মে সহায়তার অপরাধে তিন বছরের সাজা হয়।

নারী জন্মদাত্রী, ভ্রূণহত্যার বিরোধী অথচ এই অপরাধ এত ক্রমবর্ধমান যে, গত বছর রাজস্থানে একটি মেয়েকে দশটি ছেলে মিলে বিয়ে করেছে। ওই স্থানের কিছু গ্রামাঞ্চলে মেয়ে জন্মানো মহা অপরাধ। যে বাড়িতে কন্যা জন্ম নেয়, গ্রামপ্রধানের নির্দেশানুযায়ী ওই নবজাত কন্যাকে নুন খাইয়ে বা গলাটিপে, যে-কোনো ভাবে মেরে কুয়োয়, নদীতে নিক্ষেপ করতে হবে। এইভাবে ওই অঞ্চলে মেয়ের সংখ্যা কম, যার ফলে ওই মেয়েটি কোনোক্রমে বেঁচে যাওয়ায় দশটি ছেলে ওকে বিয়ে করে ভোগ্যসামগ্রী মনে করে শারীরিক, মানসিক, আত্মিক পীড়নে শোষণ করে চলেছে। যার পরিণতি নৃশংস হত্যা কিংবা আত্মহত্যা। একবিংশ শতাব্দীর প্রভাত লগ্নে যখন বিশ্বের দিকে দিকে নারী মুক্তির জয়ধ্বনি ঘোষিত হচ্ছে, ঠিক তখন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রতিদিন রচিত হয়ে চলেছে নারী ধর্ষণের কলঙ্কময় ইতিহাস। কন্যা জন্মালেই ভ্রূ কুঁচকানো, রাগে ফুসলানোর পিছনে অনেক কারণ আছে। বড় হলে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে, তার খরচা, তাছাড়া কন্যা মানেই যখন পরের বাড়ির 'স্ত্রী' নামে দাসত্ব শিকার, তার পিছনে খরচা করে পড়াশুনা করানোর কী দরকার? এর থেকে মোটা দামে ওই নিষ্পাপ কন্যাকে বিদেশে পাচার করে দেওয়া অনেক শ্রেয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিভা প্যাটেল, সুনীতা উইলিয়াম, মাদার টেরেসা, কল্পনা চাওলা, দুর্বা ব্যানার্জী, পিটি উষা সবাই যে কন্যাসন্তান, নারীজাতির সম্মান সে আর কজনের বোধগম্য হয়? সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে নিভৃতে অনেক জায়গায় যে 'কন্যাভ্রূণ হত্যা' হয়ে চলেছে উপরের ঘটনাটি আধুনিক যুগের অন্যতম দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের বিপর্যস্ত জীবনের অধ্যায় থেকে এই ঘৃণ্য অপরাধ আগাছার মতো উপড়ে ফেলতে হবে। ওই সব হৃদয়হীন, পাষণ্ডদের প্রতি তীব্র ধিক্কারের প্রতিবাদ জানাতে হবে, আধুনিক মহিষাসুরদের বধের জন্য দেবী দুর্গার ন্যায় তীক্ষ্ণ ত্রিশূল তুলে ধরতে হবে, তবে এই নিদারুণ প্রতিকৃতির কিছুটা নিষ্পত্তি হওয়া হয়তো সম্ভব হতে পারে। ▌

অতিথি কলম

সমাজ সংস্কারের উদাত্ত আহ্বান

রাকেশ সিন্‌হা

এবারের বিজয়াদশমী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের সৌজন্যে একটি বিশেষ মাইলফলক রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। এদিন তিনি ভারতের সামাজিক সমস্যাগুলি দূর করতে গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অপরিহার্যতার কথা রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পক্ষকে মনে করিয়ে দেন। এই মুহূর্তে দেশ এক কৃত্রিম বিতর্কের মুখোমুখি। কেউ কেউ বলছেন বহুত্ববাদ এবং বিবিধের মাঝে ঐক্যের ভারতীয় ধারণা আসলে আধুনিক পশ্চিমি চিন্তাভাবনার অংশবিশেষ। এই বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে মোহন ভাগবত ভারতের দুই বিখ্যাত মনিষীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। এঁরা হলেন প্রায় হাজার বছর আগে জন্মানো কাশ্মীরের শৈব উপাসক অভিনব গুপ্ত এবং দক্ষিণের বৈষ্ণব উপাসক রামানুজাচার্য। এঁরা ভারতের প্রাচীন বহুত্ববাদী পরম্পরার প্রতিনিধি। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত এই পরম্পরার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকে প্রধানত ইউরোপীয় ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত কতিপয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ভারতীয়ত্বের

সনাতন অর্থটিকে তাঁদের সংকীর্ণ বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ক্রমাগত বিকৃত করেছেন। যার ফলে আজকের প্রজন্ম ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চায় অভিনব গুপ্ত ও রামানুজাচার্যের মতো পথিকৃৎদের অবদান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মোহন ভাগবত তাঁদের কথা শুধু উল্লেখই করেননি, তাঁর বলার ধরন সমস্ত ভারতীয়ের হৃদয় ও মন স্পর্শ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর বিজয়া দশমীর দিন তিনি বনবাসী সম্প্রদায়ের রানি গাইদিনলিউ-র জন্মশতবার্ষিকীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অনমনীয় বীরত্বের গাথা বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর কথার মূল প্রতিপাদ্য সবসময়েই স্বরাজের ভারতীয় সংজ্ঞার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আবার এটাও বুঝিয়ে দেয় এই সংজ্ঞার্থ সুপ্রাচীন এক ঐক্যবদ্ধতার ফসল। কখনওই তা সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা প্রতিতুলনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি।

দুর্ভাগ্যবশত, মোহন ভাগবতের বক্তব্য ভারতীয় মিডিয়ার প্রচারে সেভাবে উঠে আসেনি। সঙ্ঘের চিরাচরিত হাফ প্যান্টের জায়গায় ফুল প্যান্টের প্রচলন হয়েছে— সেই খবর প্রকাশে মিডিয়ার উৎসাহ ছিল বেশি। যদিও সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। সাধারণ মানুষের নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে যদি কোনো সংস্থা ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করে তাহলে সেই সংস্থা সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল বেড়ে যায়। একথা ব্যক্তি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ২০-র দশকে সংবাদমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীরা গান্ধীজীর টুপি নিয়ে আলোচনা করতেন, এখনকার সংবাদমাধ্যম সঙ্ঘের পোশাক নিয়ে করে। গত একশো বছরে ভারতীয় জনমানসে সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক এবং বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের মানচিত্রটি যে অনেকটাই বদলেছে, ওপরের ঘটনা তার প্রমাণ। বস্তুত, সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশালত্ব কোনোভাবে এর প্রচারক সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। সঙ্ঘ যেভাবে সংকীর্ণ সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান দিয়ে চলেছে, সেটাই তাদের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে সঠিক অর্থে সংজ্ঞায়িত করে। এই কারণেই জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে আজ অবধি সঙ্ঘ ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিরাজমান।

বিজয়াদশমীর ভাষণে মোহন ভাগবত আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো, জাতিবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে সঙ্ঘের সাম্প্রতিক বিচারধারা। নিঃসন্দেহে তাঁর 'সংগঠিত, শক্তিশালী, শোষণমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত, সম্পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ জাতীয় জীবন' গড়ার ডাক সারা পৃথিবীর কাছে যুগান্তকারী। বিতর্কিত সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর বৈপ্লবিক অবস্থান অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য, বিশেষ করে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য এখনই ভাবা দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে সঙ্ঘ জাতিবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে

সক্রিয়। ডাঃ হেডগেওয়ার জানতেন শুধুমাত্র সাংগঠনিক কিংবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই সামাজিক অভিশাপ দূর করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার প্রয়াস রুদ্ধ হয়ে পড়ে। একই ঘটনা ঘটে সংগঠনের ক্ষেত্রেও। নারায়ণ গুরু থেকে শুরু করে হরিজন সেবক সঙ্ঘ, এ ব্যাপারে অজস্র প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে। সেই কারণেই ডাঃ হেডগেওয়ার জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতার পাপমুক্ত সমাজ গঠনকে কর্মসূচি বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে, ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জাতিবাদের সমর্থক, এমনকী সামাজিক, সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতার প্রতি মোহগ্রস্ত— এমন কেউ স্বয়ংসেবক হিসেবে সঙ্ঘে স্থান পায়নি।

জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতামুক্ত সমাজই আদর্শ সমাজ--- দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের আদর্শায়িত ভিত্তি রচনা করেছিলেন এই নীতিকে কেন্দ্র করে। ১৯৭০ সালের ১৪ জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিখ্যাত উদুপি সম্মেলনের পর, সঙ্ঘের প্রচারক সূর্যনারায়ণ রাওকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীগুরুজী লিখেছিলেন, 'আমাদের সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা এবং জাতপাত সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। এটা না হলে হিন্দু সমাজ এগোবে না, ভ্রাতৃত্বের আদর্শে ঐক্যবদ্ধও হবে না।'

সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের হাতে এক নতুন যুগের সূচনা হলো যখন তিনি ওই দুই পাপ দূর করতে সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি বলেছিলেন, 'অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয় তাহলে কোনোকিছুই পাপ নয়।' আশির দশকে ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সঙ্ঘ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু করল। লক্ষ্য, প্রান্তিক মানুষদের, বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং সেইসঙ্গে সঙ্ঘের আদর্শের ভিতটি মজবুত করা।

প্রায় আড়াই দশক ধরে ইতিবাচক গণজাগরণের লক্ষ্যে দরদি ভূমিকা পালনের পর সঙ্ঘের বর্তমান ভূমিকা যতটা আদর্শনির্ভর তার থেকে অনেক বেশি পরীক্ষানিরীক্ষা নির্ভর। মোহন ভাগবতের বিজয়াদশমীর ভাষণ তার প্রমাণ। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমরা সমাজ থেকে ভেদাভেদ এবং সংকীর্ণতা সম্পূর্ণ দূর করতে পারিনি।' যখন কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখন একটাই প্রশ্ন আমাদের বিচলিত করে। সেটা হলো, 'অতপর কী করণীয়?' সেই অকথিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মোহন ভাগবত স্বয়ং। শ্রেণীগত বৈরীভাব ও সংকীর্ণতা থেকে সমাজ এবং দেশকে রক্ষা করার নৈতিক ঐতিহাসিক দায়িত্ব সঙ্ঘের, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীভাগবত এক সমীক্ষার কথা জানিয়েছেন। সঙ্ঘ-কৃত এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মধ্যপ্রদেশের ৯০০০ গ্রামের মধ্যে ৪০ শতাংশ গ্রামে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার জাতপাতের ওপর নির্ভরশীল। তিরিশ শতাংশ গ্রামে উচ্চবর্ণের মানুষের কুয়ো থেকে পানীয় জল নেওয়ার অধিকার তথাকথিত নীচুজাতের মানুষের নেই। ৩৫ শতাংশ গ্রামে উচ্চবর্ণের জন্য চিহ্নিত শ্মশানে শবদাহের জন্য অন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এই প্রথম এমন একটি সংগঠনের মাধ্যমে এই ধরনের সমীক্ষা হলো যারা কোনো সরকারি সাহায্য পায় না এবং যারা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছে। সুতরাং এই সমীক্ষা যে সমাজ-অভ্যন্তরের প্রকৃত সংস্কারের পূর্বলক্ষণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদিন শ্রীভাগবত একইসঙ্গে ভারতের জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার সমর্থক রক্ষণশীলদের এবং প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলির কাছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থই শেষ কথা। শ্রেণীবৈষম্য টিকিয়ে রাখতে পারলেই ভোটের বাজারে তাদের লাভ। এদিন শ্রীভাগবত বলেন, 'জাতপাতের কারণে একজন মানুষ সারাজীবন অপমানিত হচ্ছেন, ওই একই কারণে একদল দাম্ভিক লোক তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে— একুশ শতকে দাঁড়িয়ে একথা ভাবতেও লজ্জা করে। এই ঘটনার জন্য সারাবিশ্বের কাছে ভারতের মাথা হেঁট হয়ে যায়।' সিংহনাদ শোনা যায় যখন তিনি বলেন, সঙ্ঘ একাই এইসব প্রতিক্রিয়াশীলদের যাবতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারে'। প্রতিক্রিয়াশীলদের চরিত্র উন্মোচিত করে তিনি বলেন, 'এরা সমাজের কোষে কোষে বৈরী এবং ভেদাভেদের মনোভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে। এদের ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না।' সামাজিক কর্মসূচিতে চারটি উপাদান অপরিহার্য : আদর্শ, অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও আবেগ। পরিবর্তন যখন আসে তখন একটা জিজ্ঞাসা সর্বস্তরে দেখা যায়, কে এই পরিবর্তনের দূত এবং কোথা থেকে তিনি এলেন? শ্রীভাগবতের দ্বিধাহীন জবাব, 'সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সমস্তরকম সামাজিক পাপ দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করছেন। জাতিবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার গভীরতা বুঝতে অনেক রাজ্যে সমীক্ষার কাজ চলছে। চলছে মানুষের মন তৈরির কাজও। সঙ্ঘের শাখাসমূহের মাধ্যমেই আমরা সমাধান খুঁজে পাব।' সঙ্ঘের শাখাই হয়ে উঠবে এই কাজের প্রধান হাতিয়ার এবং সমাজ-সংস্কারের প্রধান কেন্দ্র। একথা অনস্বীকার্য, কোনো সামাজিক কুপ্রথা আবহমানকাল চলতে পারে না। সঙ্ঘ তার সামাজিক ও গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালনের জন্য আরও একবার প্রস্তুত। মোহন ভাগবতের ভাষণ সেই ধর্মযুদ্ধেরই শঙ্খনাদ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

সিঙ্গুর প্রকরণ, শিল্পায়ন ও জমি অধিগ্রহণ

প্রয়োজন এক সাহসী, সময়োচিত ও ন্যায়োচিত পদক্ষেপ

সুব্রত ভৌমিক

সিঙ্গুরে টাটা-দের পরিত্যক্ত জমি।

সিঙ্গুর বিবাদে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের ফলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের (কৃষক, শিল্পপতি, সাধারণ মানুষ, সরকার) মনে নানা আশা- আশঙ্কার উদ্ভব হয়েছে যা সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। এর আগে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার একটা আইন করেছিল যা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধনের চেষ্টা করেও পারেনি। অপর দিকে কয়েকটি রাজ্য সরকার নিজের মতো করে তাদের জমি আইন সংশোধন করেছে। বিভিন্ন মহলের আশা-আশঙ্কা ও এরকম একটি আইনি পরিস্থিতির সার্বিক পর্যালোচনা করলে এটাই মনে হয় যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি অনুসৃত হওয়ায় পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক দর্শনের প্রেক্ষাপটে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা যে জটিল থেকে জটিলতর হবে এবং ১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন যে তার সমাধান কল্পে যথেষ্ট কার্যকরী হবে না তা আগে থেকে অনুধাবন করার দূরদৃষ্টি সরকার দেখাতে পারেনি। ফলে এই অচলাবস্থা। এই সমস্যার মূল উৎস কোথায়?

১৯৯১-এর পর খোলা বাজার অর্থনীতির হাত ধরে ভবিষ্যতে দেশি, বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের ঢল নামবে এবং পরিকাঠামো ও শিল্পায়নের জন্য ক্রমবর্ধমান জমির চাহিদা মেটাতে উর্বর ও অতি উর্বর কৃষিজমিও ব্যাপক হারে অধিগ্রহণ করতে হবে, এটা তখনই দেশের কর্ণধারদের বোঝা উচিত ছিল। তা না হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন শুরুর ফলে সরকারের তাড়াহুড়ো করে আইন প্রণয়ন বিতর্ক কমানোর পরিবর্তে বাড়িয়ে তুলেছে। কখনও কৃষক বান্ধব সাজার জন্য এমন আইন হলো যে শিল্পপতিরা মনে করল এই আইন অনুযায়ী জমি নেওয়াই সম্ভব নয় বা সেটি আর্থিক ভাবে কার্যকর নয়। আবার তা সংশোধন করে এমন আইন তৈরির চেষ্টা হলো যে কৃষকরা সেটিকে তাদের স্বার্থবিরোধী মনে করল। সরকার এই দুই পক্ষের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করতে ব্যর্থ। এর কারণ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

প্রথমত, মুক্তবাজার অর্থনীতি সঞ্জাত কৃষকদের বা মানুষের পরিবর্তিত আর্থিক দর্শনকে সরকার বুঝতে চায়নি বা অবহেলা করেছে। আগে জমি ছিল মূলধনী সম্পত্তি ও তার ব্যবহার ছিল মূলত কৃষি ভিত্তিক। সাধারণত হাসপাতাল, বাঁধ, সেতু, রেলপথ, সড়কপথ এবং সামান্য কিছু কারখানা যার অধিকাংশই ছিল বিশুদ্ধ সরকারি সংস্থা— এগুলির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হোত এবং তা অধিকাংশই ছিল অনুর্বর বা পতিত জমি। ফলে কৃষক বা সাধারণ মানুষ সেই অধিগ্রহণকে জনস্বার্থে মনে করে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ নির্বিবাদে মেনে নিত। তাদের মনে আত্মতৃপ্তি থাকত যে তাদের জমি ব্যবহার করে অন্তত কোনো শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী ফুলে-ফেঁপে উঠছে না।

কিন্তু মুক্ত বাজার অর্থনীতির হাত ধরে এখন জমি বাণিজ্যিক পণ্য বা চলতি সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এসেছে 'রিয়েল এস্টেট' নামক সব থেকে লাভজনক ব্যবসা যা এতদিন জনগণের কাছে অতটা পরিচিত ছিল না। নগরায়ন, শিল্পায়নের ফলে জমি হয়ে উঠেছে 'ব্রাউন গোল্ড' বা বাদামি সোনা। অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এই উক্তির প্রকৃত অর্থ দূরে সরিয়ে আক্ষরিক অর্থকেই মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন। ফলে যে জমি তারা বংশ পরম্পরায় চাষ করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেনই, সেই জমি শিল্পপতিরা বছরের পর বছর ব্যবহার করে ফুলেফেঁপে উঠবে— এটা তাদের মনে এক ধরনের যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। তাই জনস্বার্থ মনে করে আগের মতো নামমাত্র ক্ষতিপূরণে তারা সেই জমি দিতে সম্মত হচ্ছেন না। তারা এটা বুঝে গিয়েছেন যে জমি ছাড়া শিল্প হবে না। ফলে

গোষ্ঠীগত ভাবে কৃষকদের মধ্যে ব্ল্যাক-মেইলের প্রবণতা এসে গিয়েছে যে যতটা পারো আদায় করে নাও। শিল্পপতিদের একটাই দুর্বলতা যা তাদের 'দুর্যোধনের উরু' বা 'অ্যাকিলিস হিল' এবং সেটা হলো, ব্যবসা বা শিল্পের মূল তিনটি উপাদান 'জমি, শ্রম ও মূলধন'-এর প্রথমটাই অর্থাৎ 'জমি' তাদের কাছে নেই।

সকলের অজান্তে বিষয়টি মার্কসের শ্রম প্রধান 'Labour Theory of value'-র পরিবর্তে জমি প্রধান 'Land Theory of value'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ 'শ্রম যার লাভ তার', 'লাঙল যার জমি/লাভ তার' পেরিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্লোগান হয়ে উঠেছে 'জমি যার লাভ তার'। এক্ষেত্রে জমির চাহিদা, জোগান, বাজারমূল্য ইত্যাদি বিচার্য বিষয় নয়— মূল বিচার্য বিষয় হলো যে শিল্পপতিরা জমি ছাড়া কিছুই করতে পারবে না, তাই যে কোনো মূল্যে তাদের জমি চাই। অপরদিকে সরকারেরও শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নির্বাচনে জেতার দায় আছে— অতএব যে ভাবেই হোক সরকারকে শিল্পপতিদের হাতে জমি তুলে দিতেই হবে। কাজেই উভয়পক্ষকে ব্ল্যাকমেইল করে সামুহিক দরকষাকষির মাধ্যমে যতটা বেশি সম্ভব জমির মূল্য আদায় করার এর থেকে ভাল সুযোগ আর কী হতে পারে? অর্থাৎ কৃষকশ্রেণী ও শিল্পপতি/পুঁজিপতিরা বাজার অর্থনীতিতে জমি নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি— এবং এই প্রথম প্রভাবশালী শিল্পপতি/পুঁজিপতিরা কৃষকশ্রেণীর সম্মিলিত চাপে কাবু হয়ে পড়েছে। এই কৃষকদের মধ্যে যেমন প্রান্তিক চাষি, বর্গাদাররা রয়েছে তেমন স্বনামে-বেনামে বহু একর জমির স্বত্বাধিকারী শক্তিশালী কৃষক লবিও রয়েছে। 'সিঙ্গুর রায়' যেন বাঘকে রক্তের স্বাদ দিয়েছে। ইতিমধ্যেই দিকে দিকে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে হল্লাবোল শুরু হয়েছে।

এমনকী শিল্পায়ন হলে কৃষকদের সন্তানরা চাকরি পাবে এই যুক্তিও তাদের কাছে অচল। বর্তমানের স্বয়ংক্রিয় ও কম্পিউটার চালিত কলকারখানায় কাজ করতে যে ধরনের প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন তা অধিকাংশ কৃষক পরিবারের সন্তানদের নেই। এছাড়াও রয়েছে ব্যয়বহুল বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসিং/প্লেসমেন্টের মাধ্যমে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, যেখানে এই সন্তানরা ভর্তি হতেই পারে না। কাজেই দুর্ভাগাদের অবস্থা সহজেই কল্পনীয়। অর্থাৎ জমি দেবে কৃষকরা আর চাকরি পাবে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সন্তানরা। তারা বড়জোর মাটি কাটার বা কারখানার কাঠামো তৈরির অস্থায়ী কাজ পেতে পারে।

শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় যেমন 'ট্রেড ইউনিয়নের' জন্ম হয়, আবার অতি সক্রিয় সেই ট্রেড ইউনিয়নের বেহিসাবি ধর্মঘট, বন্ধ, ঘেরাও ইত্যাদির জন্য বহু শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে একথাও সত্য। ঠিক সেইভাবে ১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক জমি আইন বলে কৃষকদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ যেমন ঠিক নয় তেমনি কৃষকরা সম্মিলিত ভাবে বেহিসাবি দাবি করে শিল্পপতি/সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করবে এটাও ঠিক নয়।

অনেকে নিদান দিচ্ছেন যে শিল্পপতিরা চাহিদা-জোগানোর নিয়ম মেনে বাজারমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কিনুক। সবিনয়ে জানাই যে এটাও বাস্তবে মসৃণভাবে সম্পন্ন হতে পারবে না। প্রথমত ভারতের মতো রাজনীতিপ্রবণ দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের মদতপুষ্ট জমি মাফিয়া, দালাল রাজ, সিন্ডিকেট রাজ ইত্যাদির উৎপাত বাড়বে। এমনও হতে পারে যে কৃষকরা শিল্পপতিদের প্রস্তাবে সম্মত হলো কিন্তু মাফিয়ারা তা হতে দেবে না অথবা কৃষকরা সম্মত নয় অথচ মাফিয়ারা তা মেনে নিতে কৃষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত, চাহিদা ও জোগানের নিয়মে বাজারমূল্য সেই সব পণ্যের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় যা সাধারণত বিক্রয়/পুনর্বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত অথবা কেনা হয়েছে। কারণ অবিক্রীত থাকলে সেটির কার্যকরী মূল্য হ্রাস পায়, চলতি মূলধন মজুত পণ্যে আটকে থাকে এবং সেটি থেকে অন্য কোনো লাভ ব্যবসায়ী বা উৎপাদক পায় না। কিন্তু জমি কৃষকের কাছে এরকম কোনো পণ্য নয় যা বিক্রয়/পুনর্বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত বা কেনা হয়েছে। অবিক্রীত থাকলেও সেটির কার্যকরী মূল্য হ্রাস পায় না অথবা সেটি নষ্ট হয় না। জমি তো কৃষক বংশ পরম্পরায় চাষ করে আসছে। সেই জমির আয় থেকেই তার পরিবার প্রতিপালন, সঞ্চয় সব কিছু হচ্ছে। সোজা কথায় জমি বিক্রয় করাটা কৃষকের কাছে কোনো বাধ্যবাধকতা নয়। জমি তো তার কাছে মূলধনী সম্পত্তি। শিল্পায়ন জমিকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার সুযোগ এনে দিয়েছে মাত্র। তাই চাহিদা-জোগানের নিয়মে নির্ধারিত বাজারমূল্য নয় বরং সামূহিক দরকষাকষির মাধ্যমে নিজেদের মানসিক সন্তুষ্টি অনুযায়ী যতটা সম্ভব এককালীন মূল্য আদায় করাই তাদের শ্রেণী উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতেও শিল্প ও ব্যবসা সম্পর্কিত চূড়ান্ত সমস্যাকে সরকার পুঁজিপতি/শিল্পপতিদের দায় বলে পাশ কাটাতে পারে না। নীতিগতভাবে বাজার অর্থনীতিতে সরকার ব্যবসা না করলেও শিল্প ও ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ-পরিকাঠামো নির্মাণে সরকার দায়বদ্ধ। তাই সরকার জমি অধিগ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের দায় বলে এই অচলাবস্থাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানে সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সাহসী, সময়োচিত ও ন্যায়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। এব্যাপারে আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয় যে নিম্নোক্ত আইনি ব্যবস্থা কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।

(১) জনস্বার্থ এবং বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ— উভয় ক্ষেত্রেই জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

(২) নতুন আইনে বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসার প্রয়োজনে কৃষিজমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার ধারা রাখতে হবে। অর্থাৎ অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত অঞ্চলের জমির স্বত্ত্বাধিকারীদের ২/৩ অংশ যদি জমি দিতে সম্মত হয় তবে বাকিদেরও তা মেনে নিতে হবে। অবশ্য বিশুদ্ধ জনস্বার্থের কারণে (নতুন আইনে যার

স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া থাকবে) জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারাটি প্রযোজ্য হবে না।

(৩) নতুন আইনে কৃষিজমির সংজ্ঞা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করা— অধিগ্রহণের আগে থেকেই যে জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত তা কৃষিজমি রূপে গণ্য হবে এবং কেবল সেই জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট ধারা/শর্তগুলি প্রযোজ্য হবে।

যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে কৃষিজমি কিনে তা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেয় বা অন্য কোনো ভাবে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে সেই জমিতে অধিগ্রহণের সময় কৃষিকাজ চললেও তা কৃষিজমি রূপে গণ্য না হয়ে 'রিয়েল স্টেট' রূপে গণ্য হবে।

(৪) জমির জন্য ক্ষতিপূরণ— এর মূল লক্ষ্য হবে একদিকে কৃষকরা যেন বঞ্চিত না হয় অপরদিকে তারাও যেন সামূহিক দরকষাকষির মাধ্যমে অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে না পারে। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে একটু অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা যায়। যেমন—

জমির কোনো ক্রমহ্রাসমান মূল্য নেই। এটি একটি চিরকালীন সম্পত্তি। আবার ব্যবসায়িক ও আর্থিক দৃষ্টিতে ধরা হয় যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চিরকাল চলতে থাকবে। অর্থাৎ কৃষক সেই জমির কৃষিজাত পণ্যের মাধ্যমে বছরের পর বছর লাভ করতে থাকবে। আবার শিল্পপতি/ব্যবসায়ীরাও সেই জমিকে কলকারখানা বা অন্য কাজে লাগিয়ে বছরের পর বছর লাভ করতে থাকবে। এই কারণেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বপত্রে জমিকে বাজারমূল্যে না দেখিয়ে ঐতিহাসিক মূল্যে বা ক্রয়মূল্যে দেখানো হয়। দুই ক্ষেত্রেরই চিরকালীনতাকে মূল বিচার্য ধরলে জমির এককালীন বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণকে প্রাধান্য না দিয়ে আমরা সহজেই 'আয় পরিপূরণের' নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। সেটা হলো জমি থেকে কৃষকের যা আয় তা চিরকালের জন্য পরিপূরণ করে যাওয়া। এই পদ্ধতির সম্ভাব্য ধাপগুলি এরকম—

(ক) অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত অঞ্চলের কৃষি আধিকারিকরা সেখানকার জমির চরিত্র, ফসলের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং তার পাইকারি মূল্যের ভিত্তিতে বিঘা/একর প্রতি জমি থেকে অধিগ্রহণের বছরের পূর্বেকার ৩ বছরের গড় নীট আয় নির্ধারণ করবেন। এ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য যেমন— বীজ, সার, কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুৎ, ফসলের পাইকারি মূল্য ইত্যাদি কৃষক ও কৃষি আধিকারিক সকলেরই জানা। সেইজন্য মনগড়া হিসাব, পারস্পরিক অবিশ্বাস বা বিবাদের অবকাশ কম।

(খ) বিশেষ ভাবে দেখতে হবে যে কৃষিশ্রমের ক্ষেত্রে সেখানকার জমির চরিত্র অনুযায়ী বিঘা/একর প্রতি আদর্শ অনুপাত যেন লঙ্ঘিত না হয়। কৃষিশ্রম কম দেখিয়ে কৃষকরা যেন বেশি আয় বা লাভ দাবি করতে না পারে। কৃষক পরিবারের সদস্যরা, ভাগচাষিরা যদি শ্রম দেয় তবে তার মূল্য হিসাব করে নীট আয় থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ, জমি দিলে চাষের জন্য ওই শ্রম আর লাগবে না। তারা তা অন্য কাজে লাগাতে পারবে।

(গ) একইভাবে সহজলভ্য তথ্যের ভিত্তিতে বিঘা/একর পিছু কৃষিকাজে বিনিয়োজিত মূলধনের আদর্শ পরিমাণ নির্ণয় করে তার উপর ব্যাঙ্ক নির্ধারিত হারে সুদ হিসাব করে নিট আয় থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ, জমি দিলে ওই মূলধন আর চাষের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে না। কৃষকরা তা অন্য কাজে লাগাতে পারবে। এইভাবে যে চূড়ান্ত গড় নীট আয় নির্ধারিত হবে সেটাই হবে ভিত্তি বর্ষ আয়।

(ঘ) সরকার এই আয়ের সমপরিমাণ অর্থ সামাজিক দায় যোজনার অঙ্গরূপ 'পেনসন' রূপে কৃষকদের চিরকালের জন্য দিয়ে যাবে। অপরদিকে সরকার কিন্তু শিল্পপতি/পুঁজিপতিদের থেকে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জমির জন্য এককালীন মূল্য নেবে। সরকার যদি শিল্পায়নের স্বার্থে শিল্পপতিদের নামমাত্র মূল্যে জমি দেয় তবে তা কৃষকস্বার্থে কোনো প্রভাব ফেলবে না কারণ সরকার চিরকালের জন্য স্থায়ী আয় সুনিশ্চিত করবে।

(ঙ) শুধু তাই নয়, প্রতি বছর এই পেনসন কৃষিপণ্যের পাইকারি মূল্যসূচকের ভিত্তিতে বাড়বে।

আশা করা যায় যে, এই ব্যবস্থায় এমনকী প্রান্তিক চাষিরাও জমি দিতে সম্মত হবে। কারণ, তাদের জীবিকানির্বাহের একমাত্র সম্বল হাতছাড়া হলেও জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সমান পেনসন তারা চিরকালের জন্য পেতে থাকবে। শুধু তাই নয়, বনাঞ্চলের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বনবাসী, গিরিবাসীরা (তথাকথিত আদিবাসী, দলিত) উপরোক্ত পদ্ধতিতে বৈষম্যের শিকার না হয়ে লাভবান হবে। এতদিন বৈষম্যই ছিল তাদের নিয়তি।

কৃষিজমি যখন কৃষি ছাড়া অন্যকাজে ব্যবহারের জন্য বিক্রী হয় তখন সেটির বাজারমূল্য জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জল, বাজার, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ইত্যাদি ব্যবস্থার উপলব্ধতার উপর নির্ভর করে। ফলে দেখা যায় যে অধিকাংশ সময়, জাতীয় সড়কের নিকটবর্তী অনুর্বর জমির বাজারমূল্য দূরবর্তী গ্রামের অতি উর্বর জমির থেকে অনেক বেশি। এর ফলে বাজারমূল্যে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অনেক কৃষক বঞ্চিত হয়। অথচ কৃষিজমির মূল্য ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে কৃষিজ উৎপাদনের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত বলে মনে হয়— বিশেষভাবে পরিবর্তিত আর্থ- সামাজিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে।

এছাড়াও, বাজারমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কেনার সুযোগ তো থাকবেই। এটা কৃষক/শিল্পপতি/পুঁজিপতিদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হোক যে তারা সরকারের মাধ্যমে জমি হস্তান্তর করবে না। মাফিয়া রাজ, দালাল রাজ, সিন্ডিকেট রাজ ও সর্বোপরি রাজনৈতিক চাপ সহ্য করে সরাসরি জমি ক্রয়-বিক্রয় করবে। আপাতত আমরা ভাল কিছুর আশাতেই থাকি।

(লেখক ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের অ্যাসোশিয়েট সদস্য)

হঠাৎ চীনা প্রেসিডেন্টের দৌড়ঝাঁপ, বাংলাদেশ কি বাঁধা পড়ছে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডে?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং ২২ ঘণ্টার দৌড়ঝাঁপ সফরে যেন বাংলাদেশ জয় করে গেলেন। এই সেই দেশ, যে দেশটি একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেওয়া অস্ত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগী আলবদর- রাজাকাররা ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। কয়েক লাখ মহিলা সম্ভ্রম হারিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এক কোটিরও বেশি মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ভারত যেন বাংলাদেশের মানুষের পাশে না দাঁড়াতে পারে, সেজন্যে ভারত সীমান্তে সেনা সমাবেশ করেছিল চীন। জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে বাধা দিয়েছে। সেই চীনের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের দু'পাশে দুটি পাকিস্তান তৈরিই এখন চীনের লক্ষ্য। প্রশ্ন উঠেছে, অতীত ভুলে প্রেসিডেন্ট জি জিনপিংয়ের নয়া পরিকল্পনা 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডে' কি বাঁধা পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ?

চীনা প্রেসিডেন্ট জি জিনপিংয়ের (বাঁ দিকে) সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ।

সহায়তার ধরনটি পর্যালোচনা করা যাক। চীন থেকে উচ্চ সুদে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। এই ঋণ দেশের উন্নয়নে ব্যয় হবে। তবে অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা, চীনের এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে দেশের বিপদ বাড়তে পারে। কারণ, চীন থেকে নেওয়া ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হবে সার্ভিস চার্জ-সহ ২.৪৫ শতাংশ হারে। পাশাপাশি প্রকল্পের যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পণ্য চীন থেকেই আমদানি করতে হবে। এছাড়া চুক্তি কার্যকরের এক মাসের মাথায় পরিশোধ করতে হবে চুক্তির ব্যবস্থাপনা ও প্রতিশ্রুতি ফিও। এ অবস্থায় ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি যথাসময়ে প্রকল্পগুলো শেষ হওয়া নিয়েও সংশয় থাকবে। এতে করে বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ারও আশঙ্কা থাকবে।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের যে সব চুক্তি হয়েছে তাতে বাংলাদেশের বাণিজ্যে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের যেমন বাণিজ্য ঘাটতি আছে, ঠিক তেমনই থাকবে। বরং বৈদেশিক ঋণের বোঝা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। তিনি আরও বলেন, চীনের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তিতে যাওয়া উচিত হচ্ছে না, যাতে আমাদের বিপদ বাড়ে। আমাদের যেন ১০ টাকার জিনিস ২০ টাকায় চাপিয়ে না দেয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে সুস্পষ্টভাবে আমাদের চুক্তিতে যাওয়া উচিত।

পিআরআই-এর এই গবেষক মনে করেন, কেবল সরকারি আমলাদের ওপর ছেড়ে দিলে এর উপকারিতা পাওয়া যাবে না। বরং ঋণের বোঝা চাপবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। এ কারণে প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য আলাদা-আলাদা টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করে তাদের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে চুক্তিতে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য কারিগরী ও আর্থিক বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পর চুক্তি করা উচিত। চুক্তি করার ক্ষেত্রে কেবল সাবধান বা সতর্ক হলেই চলবে না, আমাদের সেই ধরনের প্রস্তুতিও থাকতে হবে। চুক্তি করলে আমাদের কতটুকু লাভ হবে, কতটুকু ক্ষতি হবে, কত টাকা খরচ হবে, কত বছরে প্রকল্প শেষ হবে, সব জেনে তারপর চুক্তিতে যাওয়া উচিত।

বাংলাদেশের আয়নায়

২৪ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানে সমঝোতা স্মারক সই করেছে চীন। এর আওতায় ঢাকা-সিলেট চার লেন, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল, ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-মাওয়া- যশোর রেলপথসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্প রয়েছে। জানা গেছে, সরকারি পর্যায়ে তিনটি বড় প্রকল্পে অর্থায়নে ৫টি শর্ত জুড়ে দিয়েছে চীন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ২ শতাংশ সুদের হার। সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করতে হবে ২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ফি ধরা হয়েছে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ এবং প্রতিশ্রুতি ফি ০.২৫ শতাংশ। ঋণ পরিশোধের সময় দেওয়া হয়েছে ২০ বছর (৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ)। এছাড়া চুক্তি কার্যকর হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা ফি পুরোটা পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং। তার ২২ ঘণ্টার সফরে ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ ও চীন। এর আওতায় ৩৪টি প্রকল্পে ২৪.৪৫ বিলিয়ন (দুই হাজার ৪৪৫ কোটি) ডলার ঋণ দেওয়ার কথা রয়েছে চীনের, যার বড় অংশই ব্যবহার করা হবে পরিকাঠামো উন্নয়নে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণের ঘোষণা বা আশ্বাস কখনও আসেনি। জি-টু-জি ভিত্তিতে প্রদেয় এই ঋণে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ঠিকাদার হবে চীনের প্রতিষ্ঠান। দরপত্র ছাড়াই নিয়োগ দিতে হবে এসব ঠিকাদারদের। ফলে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হবে পারস্পরিক দর কষাকষির মাধ্যমে। এতে প্রকল্প ব্যয় বাড়ার আশঙ্কা থাকছে।

এ প্রসঙ্গে তদারকি সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, প্রকল্প ব্যয় যদি বাস্তবের তুলনায় বেড়ে যায়, তাহলে ঋণের বোঝা বাড়ার আশঙ্কা থাকবে। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ ও জাইকার মতো প্রতিষ্ঠান ঋণ দিচ্ছে .৭৫ থেকে ১ শতাংশ হারে। তাদের তুলনায় চীনের ঋণের সুদের হার বেশি। এছাড়া চীনের প্রকল্পগুলোতে কনসাললট্যান্ট, ঠিকাদার, দরপত্র আহ্বান, পণ্য কেনাকাটা সবকিছু চীন থেকে যদি আনা হয়, তাহলে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যাবে। আর সেটা হলে আমাদের জন্য উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ও জাইকাসহ বিভিন্ন সংস্থা এ পর্যন্ত আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার পাইপলাইনে রয়েছে। অথচ এগুলো এখনও আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। দেশে অবকাঠামো দুর্বলতা দূর না হওয়ায় এই অর্থ আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। এ কারণে পরিকাঠামোগত দুর্বলতা দূর না করে চুক্তি করা হলে ঋণের বোঝা বাড়ার আশঙ্কা থাকবে।

জানা গেছে, চীনের ঋণে এরই মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর নির্মাণ ব্যয় বেড়ে গেছে। এর মধ্যে অন্যতম কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প। ২০১৩ সালে সম্ভাব্যতা যাচাইকালে এই প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছিল পাঁচ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সইয়ের সময় এর ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় আট হাজার ৪৬৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। একই অবস্থা ঢাকা-সিলেট চার লেন সড়ক প্রকল্পেও। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে চার লেন সড়ক নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় ১২ হাজার কোটি টাকা। এখন এ ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকা।

চীনের প্রেসিডেন্টের সফরকালে সরকারি পর্যায়ে ২৭টি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১৩টি চুক্তি সই হয়েছে। বেসরকারিভাবে বাংলাদেশের পক্ষে ১৩টি ও চীনের ৭টি প্রতিষ্ঠান চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সংক্রান্ত ২৭টি প্রকল্প রয়েছে। এ খাতে চীনের মোট সহায়তা হচ্ছে এক হাজার ৯৮০ কোটি মার্কিন ডলার। দু'দেশের সরকারি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্পগুলো হচ্ছে-পরিকাঠামো, সড়ক, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিকাঠামো নির্মাণে ১ হাজার ৩৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীন। পাশাপাশি রপ্তানি খাতে ১৮ কোটি ৬০ ডলারের চুক্তি হয়েছে।

গত ১৪ অক্টোবর সমঝোতা স্মারক ছাড়াও তিন প্রকল্পে সরাসরি ঋণচুক্তি সই করেছে চীন। এর মধ্যে ছয়টি জাহাজ কেনায় ১৮ কোটি ৪০ লাখ ও দাশেরকান্দিতে জল শোধনাগার নির্মাণে ২৮ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হবে। এ প্রকল্প দুটির ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এর বাইরে পায়রা বন্দরের কাছে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৯০ কোটি ডলার ঋণ দেবে চীন। এ ঋণ ছাড়াও তিন প্রকল্পে ৫৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার অনুদান দেবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ তিন হাজার ৭০০ কোটি ডলার। চীনের ঋণ যুক্ত হলে দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাড়বে প্রায় ৬৬ শতাংশ। আরও জানা গেছে, সরকারি পর্যায়ে যে ২৭টি চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে তিন প্রকল্পের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সমঝোতা চুক্তির আওতায় ২৮টি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত কোনো শর্ত নির্ধারণ করা হয়নি। পরে চীনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শর্ত ও সুদ হার নির্ধারণ করা হবে বলে জানা গেছে। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

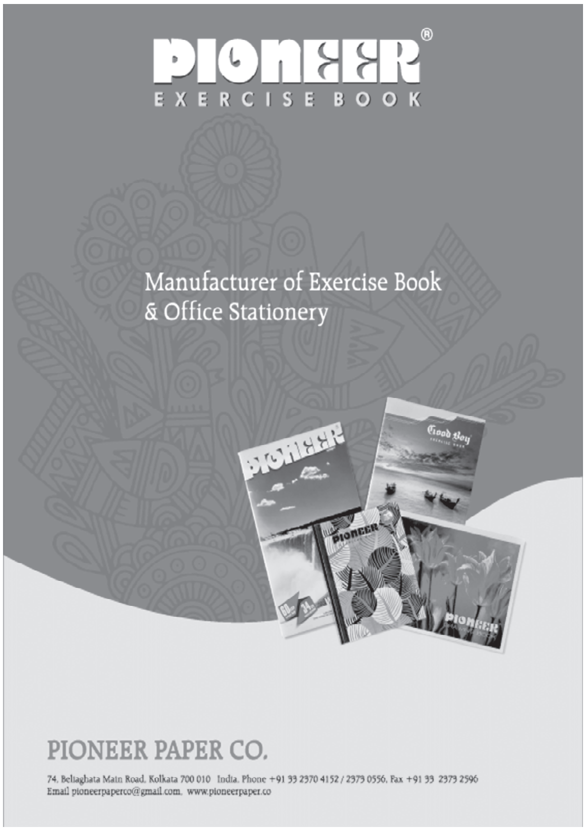

"ভারতের মাতৃহৃদয় যদি নিজ দেশের এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার মর্ম ও প্রয়োজনীয়তা এবার অনুভব করে, তাহলে আমরা দেখব, সব ভেদাভেদ, সমস্ত অসুবিধা দূর হয়ে এমন এক নতুন যুগের অভ্যুদয় হবে, যাতে অতীতের সকল উপলব্ধি মুকুলিত ও পুষ্পিত হয়ে উঠবে।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

কেন্দ্রের শরণার্থী নোটিফিকেশন রাজ্যে কেন কার্যকরী হচ্ছে না

ধর্মানন্দ দেব

২০১৪-র লোকসভার পর সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হিন্দু বাঙালি এলাকায় কেন্দ্রের মোদী সরকারের জারি করা দুটি গেজেট নোটিফিকেশন নিয়ে। কিন্তু সমালোচনার পাহাড় হয়ে যাওয়া সেই চর্চা আজ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সামনে চলে এসেছে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গ, অসমের নাগরিক পঞ্জি এবং ও আই এবং এনওআই সমস্যা ইত্যাদি। যদিও নাগরিকত্ব বিলের ভবিষ্যৎ এখন বিশবাঁও জলে। আজকের আলোচ্য বিষয় সমালোচনায় স্তিমিত হয়ে যাওয়া সেই দুটি গেজেট নোটিফিকেশন নিয়ে। এই গেজেট নোটিফিকেশন নিয়ে কুৎসাও রটানো হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কেউ কেউ এই গেজেট নোটিফিকেশনকে 'কচুপাতা', 'প্রেসক্রিপশন', 'এক পয়সার মূল্য নেই' 'ভাঁওতা', 'ধোঁয়াশা' ইত্যাদি বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর বিশেষণে বিশেষিত করছেন। শুধু পাতি নেতারা নন, অনেক আইন প্রণেতা, এমনকী আইন বিশারদ, আইনে ব্যারিস্টার ডিগ্রি থাকা লোকরাও এধরনের মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলছেন কেন্দ্র সরকার নাকি এই নোটিফিকেশন ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য জারি করেছে। অনেক সাংবাদিকের মোদী সরকারের সমালোচনায় কলম এখনো থামেনি। বরং শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় এখনো সময় সুযোগ পেলেই বেছে বেছে সমালোচনা করে যাচ্ছেন। এককথায় বলতে গেলে বলা যায় নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সমালোচনা এখনো অটুট রয়েছে। কিন্তু এই গেজেট নোটিফিকেশন কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, আইনসঙ্গত বা মূল্য রয়েছে তা বিচার করার ভার পাঠকদের উপরই।

২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭-৪৭ মিনিটে কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে— '৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি এবং শিখ ধর্মালম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন প্রযোজ্য হবে না। মানবিক কারণেই তাদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই।'

এই সরকারি প্রেস রিলিজে আরো স্পষ্ট বলা হয়েছে এইরূপ— 'The Central Government has accordingly issued two Notifications in the Official Gazette today under the Passport (Entry into India) Act, 1920 and the Foreigners Act, 1946'. এখন কথা হচ্ছে অফিসিয়াল গেজেট কী? অফিসিয়াল গেজেট হচ্ছে সরকারি সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রেই পর্যায়ক্রমে সরকারি ঘোষণাপত্র, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশ হয় জনসাধারণের জন্য। ওই সংবাদপত্রের অন্য নাম হচ্ছে ভারতের রাজপত্র। এই রাজপত্র ছাপার কাজ হয় সরকারি প্রেসে। সরকারের সংশ্লিষ্টমন্ত্রক থেকে নোটিফিকেশন, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির সফট কপি এবং হার্ড কপি দু'টি-ই পাঠাতে হয় সরকারি প্রেসে এবং সঙ্গে একটি মন্ত্রকের আধিকারিকের উভয় কপির বিষয় একই এবং শুদ্ধ বলে ঘোষণা দিতে হয়। প্রকাশনার কাজে যিনি প্রধান, তাঁকে কন্ট্রোলার বলা হয় এবং এর কার্যালয় নতুন দিল্লীর নির্মাণভবনে রয়েছে। রাজপত্রে ওই নোটিফিকেশন প্রথমে হিন্দিতে এবং পরে ইংরেজি ভাষায় লেখা থাকে।

কেন্দ্র সরকারের জারি করা পাসপোর্ট আইন-১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের অধীনে দু'টি নোটিফিকেশন অর্থাৎ ঘোষণাপত্র অফিসিয়াল গেজেট বা রাজপত্রে প্রকাশ পায় ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। সরকারি নির্দেশ নম্বর হচ্ছে— G.S.R. 685(E) under Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920) এবং G.S.R. 686(E) under Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) এবং নোটিফিকেশন অনুসারে ওইদিন থেকেই তা সমগ্র দেশে কার্যকর।

এখন দেখে নেওয়া যাক এই দু'টি নোটিফিকেশন কেন্দ্র সরকারের জারি করার পিছনে বৈধতা কতটুকু। আইন অনুসারে কেন্দ্র সরকারের পক্ষে কি সম্ভব এই দু'টি রুলস তৈরি করা অর্থাৎ ক্ষমতা রয়েছে কি কেন্দ্র সরকারের? ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনে মোট ১৬টি অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের শিরোনাম রয়েছে এইরূপ— 'Power to make Orders'। এছাড়াও ওই ধারার ১ নম্বর উপধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে— 'The Central Government may, by order (Foreigners Order 1948) make provision, either generally or with respect to all foreigners or with respect to any particular foreigner or any prescribed class or description of forigner, for prohibiting, regulating or restricting the entry of foreigners into India or

their departure there from or their presence or continued presence therein.'

তাই আমাদের বলতে বাধা নেই যে এই আইনের অধীনে কেন্দ্র সরকার নোটিফিকেশন জারি করেছে সেটা সম্পূর্ণ আইনমোতাবেক এবং তা দেশে লাগু হতে কোনো বাধা আইনত নেই। সেই একইভাবে যদি আমরা পাসপোর্ট আইন-১৯২০ দেখি তখন দেখব ওই আইনে রয়েছে মাত্র ৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে কেন্দ্র সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছে যে কোনো রুলস তৈরি করার। ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের শিরোনাম রয়েছে এইরূপ : ''Power to make rules.' এছাড়াও ওই ধারার ১ নম্বর উপধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে :

''The Central Government may make rules requiring that person entering in India shall be in possession of passports and for all matters ancilliary or incidental to that purpose.''

তাই ওই আইনের অধীনে কেন্দ্র সরকারের জারি করা নোটিফিকেশন সম্পূর্ণভাবে বৈধ অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত।

এখন দেখে নেওয়া যাক এই দু'টি নোটিফিকেশনে মানুষ কতটুকু উপকৃত হয়েছেন। সংখ্যার হিসাবে অতি নগণ্য অর্থাৎ হাতেগোনা কয়েকজন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের নির্দেশ (নোটিফিকেশন) রাজ্যে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় ওই রাজ্যের সরকারের। আমাদের সকলের জানা আইন সকলের জন্য সমান। তাই কেন্দ্রের জারি করা ওই দু'টি নোটিফিকেশন অনুসারে অসমের রাজ্য সরকার, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার, ত্রিপুরার রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? যেহেতু এই দু'টি নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করেই মানুষ সুরক্ষা পাচ্ছেন। হতে পারে হাতে গোনা কয়েকজন বা আদালতের নির্দেশে। তাই বলে রাজ্য সরকারগুলি চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ২০১৬ সালের ৯ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায় আমাদের সামনে আসে। ওই ঐতিহাসিক রায়টি অতি সংক্ষেপে পাঠকের সামনে তুলে ধরছি :

ঘটনার সূত্রপাত ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রঞ্জিত কুমার মজুমদার, তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন। উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরের ইস্কন মন্দির দর্শন। রঞ্জিত কুমার মজুমদারের পাসপোর্ট নম্বর— AA0878316, তাঁর স্ত্রীর পাসপোর্ট নম্বর— AG7082674 এবং তাঁর মেয়ের পাসপোর্ট নম্বর— AD1250650. ভারতে আসার পর মজুমদার পরিবার পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে থাকেন এবং ধীরে ধীরে মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে মন্দিরের কাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেন। উল্লেখ্য, মজুমদার পরিবারের পাসপোর্ট পাওয়া থেকে শুরু করে পাসপোর্টের মেয়াদ বর্ধিতকরণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশি নাগরিক সঞ্জিব কুমার বিশ্বাস। মূলত সঞ্জিব কুমার বিশ্বাস ভারতের নাগরিক এবং তার বাবা ননি গোপাল বিশ্বাস আজ অবধি ভারতেই রয়েছেন। অবশ্য বর্তমানে সঞ্জিব কুমার বিশ্বাস আমেরিকার নাগরিক। সঞ্জিব কুমার বিশ্বাস এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার নাম করে মজুমদার পরিবারের নাবালিকা মেয়েকে একবার ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। আর এই নাবালিকা মেয়ে ২০১৪ সালের ২৭ অক্টোবর সঞ্জিব কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় একটি মামলা রুজু করে। নবদ্বীপ থানার মামলা নম্বর ৬০৬/২০১৪।

মজুমদার পরিবার মায়াপুর ইস্কন মন্দিরে আসার পর তাদের গুরু হিসেবে ছিলেন হরেকৃষ্ণ দাশ এবং প্রায় দুই বছরের বেশি সময় মন্দিরে অতিবাহিত করার পর ২০১৫ সালের ৩ জুলাই সেই সঞ্জিব কুমার বিশ্বাসের পিতা ননি গোপাল বিশ্বাস 'মজুমদার' পরিবারের উপর ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে থেকে যাওয়ার জন্য এবং কিছু জালিওয়াতি করে নথি বানানোর অভিযোগ এনে নবদ্বীপ একটি থানায় মামলা করেন। এই মামলা সূত্রেই ২০১৫ সালের ২০ জুলাই নবদ্বীপ পুলিশ মজুমদার পরিবারকে আটক করে কারাগারে প্রেরণ করে। বিভিন্ন কাঠখড় পুড়িয়ে মজুমদার পরিবার জামিন না পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বিচারপতি শঙ্কর আচার্যের বেঞ্চ ২০১৬ সালের ৯ মার্চ এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে মজুমদার পরিবারকে খোলা আকাশের নীচে এবং মুক্ত বাতাস নেওয়ার জন্য অর্থাৎ জামিন মঞ্জুর করেন।

রায়টি ঐতিহাসিক এই কারণেই, কেননা মজুমদার পরিবার জামিন পায় কেন্দ্র সরকারের ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত দু'টি গেজেট নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করেই। তাই নোটিফিকেশনটি হিন্দুদের জন্য রক্ষাকবচ। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি এবং শিখ ধর্মালম্বী মানুষের কাছে এই দুটি গেজেট নোটিফিকেশন অ্যান্টিবায়োটিক। কেন্দ্র সরকার ওই মামলায় আদালতকে জানিয়েছে নোটিফিকেশনের শর্ত হচ্ছে—

(১) বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি এবং শিখ ধর্মালম্বী মানুষ হতে হবে।

(২) ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আসতে হবে।

(৩) ভারতে প্রবেশ করতে হবে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে।

এছাড়াও কেন্দ্র সরকার ওই মামলায় (মজুমদার পরিবারের) জানায় যে নোটিফিকেশনের শর্ত প্রযোজ্য হবে আপনা হতেই। স্পষ্ট এইরূপ :

''(iv) The provisions in the notifications...are to apply automatically.''

কেন্দ্র সরকার আরো স্পষ্ট জানায় আদালতকে :

'The notification and Order dated 07/09/2015 protects such Bangladeshi and Pakistani Nationals fullfilling the conditions mentioned in those two instruments from prosecution under the Passport (En-

try into India) Act, 1920 either without valid documents, with valid travel documents, the validity of which expire, and also from deportation proceeding.

কেন্দ্র সরকারের এই কথা থেকে দ্বিমত নেই যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি এবং শিখ ধর্মালম্বী মানুষের উপর ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনে কোনো মোকদ্দমা চলতে পারে না। এটাতো গেল কেন্দ্র সরকারের কথা। এখন দেখে নেওয়া যাক, কলকাতা কী হাইকোর্টের রায়ের ৭ নম্বর প্যারাগ্রাফ :

"We find that so far as charges against the Petitioners under Foreigers Act, 1946 is concerned, the aforesaid Notifications and the Order protect them from prosecution under the 1946 Act..."

শুধু তাই নয়, কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে যে কেন্দ্রের জারি করা দু'টি গেজেট নোটিফিকেশনে বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোথাও বলে নাই যে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আসা শরণার্থীদের অভিযোগ জানানোর কার্যালয়ের নাম ও কর্তৃপক্ষের নাম। অর্থাৎ কলকাতা হাইকোর্ট পরোক্ষভাবে বলেছে যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা ওই দুটি দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আসার কথা যখন কোথাও জানাবেন সেটাকেই মেনে নিতে হবে। তাই মজুমদার পরিবারের জামিনের আবেদনপত্রে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকারের কথাকে আদলত মেনে নেয়। বলাবাহুল্য মামলা হয় ২০১৫ সালের ৩ জুলাই। তাই গেজেট নোটিফিকেশন পুরনো মামলার ক্ষেত্রেও বৈধতা রয়েছে বলা যায়। শুধু কলকাতা হাইকোর্ট নয়, বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা গৌহাটি হাইকোর্টে বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে গৌহাটি হাইকোর্টেও এই নোটিফিকেশন নিয়ে বেশ কয়েকটি মূল্যবান রায় প্রদান করেছেন। ওই রায়গুলিতেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কেন্দ্রের জারি করা দু'টি গেজেট নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি এবং শিখ ধর্মালম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে প্রবেশ করা মানুষকে গ্রেপ্তার না করার জন্য এবং ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে রেহাই-য়ের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের কথা বলেছে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি রিট পিটিশন (সিভিল) মামলার নম্বর তুলে ধরছি। সেগুলি হচ্ছে রিট পিটিশন (সিভিল) নম্বর--- ৫৬০২/২০১৫, ৫১২৬/১২, ৪৮৩৩/১১, ৫৯৭৭/১৫। যদিও বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণের পর আর একটিও গৌহাটি হাইকোর্টের রায়ে কেন্দ্রের জারি করা দু'টি গেজেট নোটিফিকেশনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাই এই মুহূর্তে অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে সামনে আসে কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়।

> **"হিন্দু বাঙালির স্বার্থে সবাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। এক্ষুনি উপযুক্ত সময়, ঘরে বসে না থেকে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করতে হবে মোদী সরকারের জারি করা নোটিফিকেশন নিজ নিজ রাজ্যে কার্যকরী করে তোলার জন্য।"**

পরিশেষে বাস্তব পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে বলা যায় আপনা থেকেই ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষ ছাড় পাবেন না। প্রয়োজন রয়েছে রাজ্য সরকারের ওই নোটিফিকেশন দু'টি রাজ্যে লাগু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের। রাজ্যে সরকারের এব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন ও বিদেশি ট্রাইব্যুনালকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে হবে। তবে মজুমদার পরিবারের মামলা থেকে বলা যায় মোদী সরকারের জারি করা দু'টি গেজেট নোটিফিকেশন আইনত বৈধ এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক। তাদের উপর বিদেশি আইনের কোনো মামলা চলতে পারে না। রাজ্য সরকারের এক্ষুনি উচিত কেন্দ্রের দুটি নির্দেশ (গেজেট নোটিফিকেশন) মেনে পুলিশ প্রসাসন ও জেলা প্রশাসনকে এই ব্যাপারে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা। অসম রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি সরকারে এসেছে। আর কেন্দ্রেও রয়েছে বিজেপি সরকার। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অসমেও রয়েছে শরণার্থী সমস্যা। অসমে বিজেপি সরকার হওয়ার প্রায় চার মাস হয়ে গেলেও কেন্দ্রের জারি করা নোটিফিকেশন রাজ্যে লাঘু করার জন্য কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। তাই প্রয়োজন রয়েছে হিন্দু বাঙালির স্বার্থে সবাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। এক্ষুনি উপযুক্ত সময়, ঘরে বসে না থেকে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করতে হবে মোদী সরকারের জারি করা নোটিফিকেশন নিজ নিজ রাজ্যে কার্যকরী করে তোলার জন্য। তখনই প্রমাণ হবে কার কতটুকু হিন্দুর প্রতি প্রীতি-ভালবাসা রয়েছে। না সবই লোক দেখানো।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখার উদ্যোগে পারিবারিক মিলন উৎসব

গত ৩০ অক্টোবর বিজয়া ও দীপাবলী উপলক্ষে সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার উদ্যোগে পারিবারিক মিলন উৎসবের আয়োজন একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করা হয়। 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কবি ও সাহিত্যিক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশানন্দ মহারাজ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর কার্যকরী উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য। মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন তন্দ্রা সরকার, জয়ন্তী মণ্ডল ও প্রজ্ঞাময়ী মণ্ডল। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বেলা ২ টা থেকে স্বদেশমন্ত্র পাঠের প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয় অনুষ্ঠান শেষে। সুভাষ ভট্টাচার্য সংস্কার ভারতীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশানন্দ মহারাজ মানব জীবনে ভাগবত গীতার মাহাত্ম্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন ও ভারতবর্ষের যুবসমাজকে ভারতমাতার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জাদুকর দুলাল চন্দ্র মণ্ডল চিত্রে ও ছড়ায় এক অনবদ্য লেখচিত্র অঙ্কন করেন। কবি ঋদেনদিক মিত্র স্বরচিত ইংরেজি কবিতা পাঠ করেন। গোপাল চন্দ্র দাস বাউল, সুমন সরকার ও মহুয়া চৌধুরী একটি করে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলাসঙ্গত করেন নিখিল ঘোষ ও পঙ্কজ ধর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন পরিমলেন্দু সরকার ও রাজকুমার মিস্ত্রি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুষেণ কুমার রায়।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সমাবেশ সমাচার

তাঁতিবেড়িয়ায় রক্তদান শিবির

হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ভারতীর উদ্যোগে গত ২৩ অক্টোবর তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির পরিসরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৪১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা-সহ মোট ৪৩ জন রক্তদান করেন। মানিকতলা সেন্ট্রাল ব্লাডব্যাঙ্কের পক্ষে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হুগলী বিভাগ কার্যবাহ তাপস ভট্টাচার্য, হাওড়া জেলা কার্যবাহ দীপঙ্কর নস্কর, জেলা প্রচারক অর্জুন বিশ্বাস, জেলা সঙ্ঘচালক প্রভাতকুমার মণ্ডল প্রমুখ।

মঙ্গলনিধি

হাওড়া জেলার মহিয়াড়ী অঞ্চল ১নং এবং ২নং মণ্ডল প্রমুখ তরুণ কুমার ভগত তাঁর একমাত্র পুত্র স্বপ্ননীলের শুভ জন্মদিনে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলী বিভাগ প্রচারক তাপস বারিক, জেলা প্রচারক অর্জুন বিশ্বাস এবং ডোমজুড় খণ্ড কার্যবাহ সুন্দর ঘোষ।

শোকসংবাদ

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নদীয়া জেলা সভাপতি রঞ্জন ব্যানার্জীর মাতৃদেবী শিখা ব্যানার্জী গত ২৮ অক্টোবর পালপাড়ার নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি স্বামী ও দুই পুত্রকে রেখে গেছেন।

* * *

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার শ্রীরামপুর গ্রামের স্বয়ংসেবক তথা ছাতনী সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য শান্ত ঘোষের মাতৃদেবী অতসী ঘোষ গত ২৫ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ৬ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

কম্পিউটার কি বিশ্বদাবার বিকল্প?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কম্পিউটারকে আজ দাবার পণ্ডিত করে তোলা হচ্ছে। একটি কম্পিউটার যে একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়ানকে হারিয়ে দিতে পারে— এ ঘটনা বিশ্ববাসী প্রথম প্রত্যক্ষ করে ১৯৯৭ সালে। সুপার গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভকে আই বি এম ডিপ-ব্লু সুপার কম্পিউটার ছয় গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে দিলে শোরগোল পড়ে যায় বিশ্বক্রীড়া-সমাজে। অবশ্য পরে আনাতলি কারপভ ও বিশ্বনাথন আনন্দ এই কম্পিউটারকে বশীভূত করতে সক্ষম হন আপন মেধা ও বুদ্ধির দৌলতে। ১৯৬৮-তে ব্রিটেনের এক দাবাবিশারদ ও সাংবাদিক ডেভিড লেভি মন্তব্য করেছিলেন, কম্পিউটার কখনো একজন গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারাতে পারবে না। সাত-আটের দশকে এ ধরনের বহু 'গেম' খেলা হয়েছে। প্রতিবারই কম্পিউটার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে মানুষের ধীশক্তি ও মনীষার কাছে। ১৯৯৭-এ এসে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়। সুপার কম্পিউটার ডিপ-ব্লু ছিল বিশেষভাবে নির্মিত, অসংখ্য প্যাকেজ-সংবলিত।

একজন গ্র্যান্ডমাস্টার একনাগাড়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করলে তাঁর শরীরে এবং মনে ক্লান্তি আসে, কিন্তু কম্পিউটারের ক্লান্তি নেই। ফলে তাকে 'টাইম প্রেসারে' পড়তে হয় না। আসলে দাবা খেলায় মানুষের বুদ্ধি, ধৈর্য, জ্ঞান, শিল্প ও বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়তে বোর্ডে মুখোমুখি বসে। আর সেই খেলায় রয়েছে কত নাটকীয়তা, কত রোমাঞ্চ, কত আবেগ! কম্পিউটারে এর কোনোকিছুই প্রতিফলিত হয় না।

বড় বড় দাবাড়ুদের খেলার কয়েক হাজার 'থিওরি' ও 'থিওলজি' মনে রাখতে হয়। মনে রাখতে হয় ওপেনিং, মিডল ও অ্যান্ড গেমের জটিলতম পরিস্থিতিগুলি। মনে রাখতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতগুলি চাল দিতে হবে, তার প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা কোথায় ইত্যাদি। এমনই হাজারো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে একজন দাবাড়ু তার খেলার মৌলিক দিকটি গড়ে নেয়। রুশ গ্র্যান্ডমাস্টার স্টাইনিৎজ বলেছিলেন, তিনি দাবা খেলায় প্রতিপক্ষের কথা ভাবেন না। ছকের ওপর ঘুঁটি কীভাবে রয়েছে— সেটাই তাঁর একমাত্র বিচার্য বিষয়। কিন্তু সেটা পুরো সত্য নয়। দাবা খেলায় মুখোমুখি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনেই দুজনকে প্রভাবিত করে, সেটাই অনেক সময়ে ম্যাচে জয়-পরাজয়ের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি কম্পিউটারের সেদিক থেকে কোনো চিন্তা নেই। সামনে যেই থাকুক না কেন, কম্পিউটার বোর্ডের ওপর ঘুঁটির অবস্থান অনুযায়ী খেলে। প্রতিপক্ষের কত বয়স, কী নাম, কী তার ট্র্যাক-রেকর্ড— এসব তার মাথায় আসে না, কেননা তার মাথায় এসব তথ্য ঢোকানোই হয় না।

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে কম্পিউটার নয়, ছোট ছোট ক্যালকুলেটিং মেশিনের মতো যন্ত্রগুলিকে 'দাবাড়ু' তৈরি করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এগুলির সুবিধা হলো, একজন ইচ্ছা করলে এক 'অ-মানব' প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেখানে খুশি, যখন খুশি দাবা খেলতে পারবে। এই যন্ত্রে মানুষ যা চাল দেবে, তা যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো সুইচ বা বোতামের সাহায্যে জানিয়ে দেওয়া যাবে এবং যন্ত্রটি কিছু পরে তার চাল জানিয়ে দেবে। একটা সাজানো দাবার ছকে একজন খেলোয়াড় এবং যন্ত্র চাল দিতে থাকবে। এরকম একটি দাবার নাম রাখা হয়েছে 'বরিস'। ব্রিটিশ চেস ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে— ''বরিস হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের চেস কম্পিউটার। একে সমস্তরকম বহুল পরিচিত দাবার চাল শেখানো হয়েছে। সাদা নিয়েও বরিস খেলতে পারে, কালো নিয়েও পারে। সে আপনাকে দাবাখেলা শেখাতেও পারে। যখন আপনি বুঝতে পারছেন না কী চাল দেবেন, তখন বরিস সাহায্য করবে। গেম চলাকালীন বরিস কথাও বলবে। কোনোরকম বে-আইনি চাল সে বরদাস্ত করবে না।''

এখন আরো উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার বিশ্বদাবা সার্কিটে এসে গেছে। ছোট বয়স থেকেই পশ্চিমি দাবাড়ুরা এই কম্পিউটার, ডিজিটাল ল্যাপটপ, ডি. টি. এস টার্মিনাল সহযোগে নিজেদের প্রশিক্ষিত করেছে। ভারতেও যারা সচ্ছল পরিবারের দাবাড়ু, তারা এই ধরনের সুবিধা ভোগ করছে। দিব্যেন্দু বড়ুয়া যেখানে দাবাজীবনের মধ্যপর্বে এসে ভাল চাকরির সুবাদে আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহচার্য পেয়েছেন, সেখানে হরিকৃষ্ণ, শশীকিরণরা কৈশোরেই এর যাবতীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে টিন এজেই 'গ্র্যান্ডমাস্টার'।

তবে যতই কম্পিউটার বা ল্যাপটপ আসুক, ববি ফিশার, গ্যারি কাসপারভ, আনাতলি কারপভ বা আমাদের বিশ্বনাথন আনন্দের মতো সুপার গ্র্যান্ডমাস্টাররা কিন্তু আপন মেধা, বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী মনস্বিতার ফসল। কম্পিউটার তাঁদের অনুশীলনের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত উৎকর্ষপূর্ণ পরিণতি দিতে পারে না। নিজস্ব সৃজনশীলতা, বৈচিত্র্য, আত্মপ্রত্যয় ও মৌলিক গুণাবলীই একজন দাবাড়ুর সার্বিক উত্তরণের চালিকাশক্তি। যতই স্যাটেলাইট বা ইন্টারনেটে দাবার প্রসার হোক, দুজন সমমানের শক্তিশালী গ্র্যান্ডমাস্টারের মুখোমুখি লড়াই আমাদের যে-উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক দিতে পারে, তার তুলনা মেলা ভার। সুপার কম্পিউটার হয়তো এক-আধবার গ্যারি কাসপারভকে হারাবে, কিন্তু তাতে দাবার কিছু যায় আসে না। প্রযুক্তি কখনো মানুষের আত্মলব্ধ দক্ষতা, প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিপূরক হতে পারে না।

শব্দরূপ-৮০৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

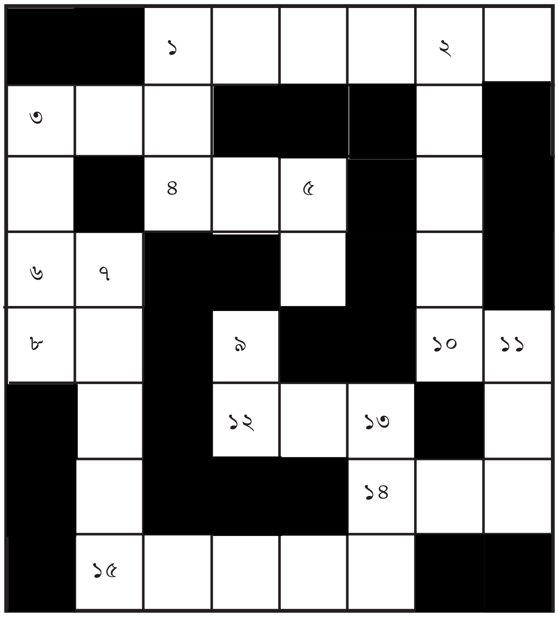

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উক্ত সাগরোত্থিতা দেবী, **৩.** শিশুর স্বপ্নে হাসিকান্না, **৪.** জলবর্ষী ও গর্জনকারী মেঘ; ইন্দ্র, **৬.** চাকর, ভৃত্য, **৮.** সহিত, **১০.** তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত, **১২.** যজ্ঞকাষ্ঠ, ইন্ধন, **১৪.** যে লৌহপীঠের ওপর ধাতু পেটা হয়, **১৫.** করিরাজি ওষুধ বিশেষ; কথিত আছে ঋষি চ্যবন এটি সেবন করে নবযৌবন লাভ করেছিলেন।

উপর-নীচ : ১. ভূষণ; ময়ূরপুচ্ছ, **২.** 'সায়েন্স সিটি'-র বিপরীতে কলকাতার একটি বিখ্যাত জমায়েতস্থল, **৩.** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রায়িত বিখ্যাত উপন্যাস, **৫.** অর্পিত; গচ্ছিত, **৭.** সহজে হজম হয় এমন, **৯.** গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নৃত্যলীলা, **১১.** মাধবের ডাক নাম, **১৩.** বৃহৎ চঞ্চু পক্ষী; কুবের।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০৫
সঠিক উত্তরদাতা
সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

		এ	কা	ম্র	কা	ন	ন
ব	লা	কা				দে	
ড়		ক্ষী	রি	কা		র	
বা	ঘ			কী		চাঁ	
	র্ম		অ			দ	প
	চ		পু	ষ্প	ক		র
	টি				র	মে	শ
অ	কা	ল	কু	ষ্মা	ণ্ড		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮০৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ নভেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

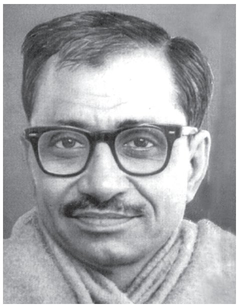

পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্র অনুসারে নগরায়ণের স্তরকে উন্নয়নের ভিত্তি মনে করা হয়। ভারতেও ধীরে ধীরে নগরের সংখ্যা ও জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। শহরগুলি পশ্চিমি জীবনের বহু সামাজিক, নৈতিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এজন্য ব্যয়ভার বেড়েছে। ভারতে উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে ঘনজনবসতি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। টিবি-র মতো ভয়ঙ্কর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এতে সহজেই হয়। আমাদের শহরগুলিতে বস্তির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রয়োজন নতুন শহর তৈরি করা নয়, গ্রামগুলিতে কুটিরশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সৃষ্টি করতে হবে।

* * *

'প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে তার ক্ষমতা অনুসারে কাজ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যকতার পূর্তি'— এই আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে পরিবার। পরম্পরাগত কারণে প্রত্যেকের মনে এই ভাবনা সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পরিবারের 'কর্তা' সদস্যদের ভোটের ওপর নির্ভর করেন না। তারা কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে তা শেখানোর জন্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় না। তারা তাদের অগ্রজদের পথ অনুসরণ করে অন্তরের প্রেরণায় এই দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু একটি স্পর্শকাতর সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় যে, এতে সম্পদের বিতরণ কীভাবে করা হবে। যখন বিভিন্ন দিকে জমির মালিক, ভূমিহীন ব্যক্তি ও ন্যায্য দাবিদার একত্র হয় তখন উৎপাদনের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা সমানভাবে বিতরণ করা যেতে পারে, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত হবে না।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ১০

সেনাবাহিনীকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা : আপনারা আছেন বলে দেশ রাতে ঘুমোতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দীপাবলীর উৎসব পালন করলেন হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলার লাহুল-স্পিটির অন্তর্গত সিনো ইন্ডিয়ান বর্ডারে— সেনাবাহিনী, ইন্দো-টিবেটান সীমাপুলিশ এবং ডোগরা স্কাউটের জওয়ানদের সঙ্গে। এমন এক

সময়ে এই ঘটনা ঘটল যখন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে উষ্ণতা প্রায় নেই বললেই চলে এবং টেনশনের পারদ ক্রমশ চড়ছে। বেতারে সম্প্রচারিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর বীরত্ব এবং সাহসিকতার পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে উৎসবের সময় সেনাবাহিনীর অবদানের কথা মনে রাখতে বলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সেনাবাহিনী সর্বস্ব পণ করে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে চলেছে। তাঁদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ আমাকে অভিভূত করে। আসুন, আমরা এই দীপাবলী সেনাদের জন্য উৎসর্গ করি।' দেশের হৃদয়ের উষ্ণতা সীমান্তের ভয়াবহ বাতাবরণে ছড়িয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'দেশের নিরাপত্তার জন্য আমাদের সেনারা সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে। কেউ মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন তো কেউ রয়েছেন হিমালয়ে। কেউ রক্ষা করছেন শিল্পাঞ্চল, কেউ বিমানবন্দর। প্রত্যেকেই কঠিন দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা যদি এই উৎসবের সময়ে তাদের অবদানের কথা মনে রাখি তাহলে প্রতিটি সৈন্যের শক্তি এবং উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'

সুরক্ষিত শিশু-জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিশ্বে প্রতি সাতজন শিশুর মধ্যে অন্তত একজনের মৃত্যু হয় অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণের কারণে। ইউনিসেফের সমীক্ষায় উঠে এল এমনই এক ভয়াবহ তথ্য। এর মধ্যে ভারতের হালও বেশ খারাপ। ২০১২ সালে গৃহীত এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ভারতে ৩০ কোটি শিশুর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণে মৃত্যু হয়েছে লক্ষাধিক শিশুর। মূলত জ্বালানি, ঘিঞ্জি পরিবেশে, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ইত্যাদির কারণেই ঘরের বায়ু দূষিত হয়। এই পরিসংখ্যান যখন গৃহীত হয় তখন দেশের ৬০ শতাংশ বাড়িতেই অস্বাস্থ্যকর জ্বালানি প্রচলিত ছিল। ফলে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেশি ছিল। কিন্তু মোদী সরকারের ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার ফলে অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের পরিমাণও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুতরাং সুরক্ষিত হবে শিশুর জীবনও।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলনে সাড়া দশ হাজারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) প্রচলনে অভূতপূর্ব সাড়া পেল আইন কমিশন। সম্প্রতি দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলন করা উচিত কিনা এই বিতর্কে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন বলে কমিশন সূত্রে খবর। কমিশনের চেয়ারম্যান বি এস চৌহ্বান একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, উপাসনা-পদ্ধতির গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে অধিকাংশ মানুষই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক লোলুপ একশ্রেণীর পেশাদার রাজনীতিকরা তালাক বন্ধের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে। এরাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলন না করার জন্য নানান ধরনের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এদের মোকাবিলা করাই এখন ল কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
7 November - 2016 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।